স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ : তমলুক
মেদিনীপুর

প্রকাশক :
স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
তমলুক : মেদিনীপুর

প্রথম প্রকাশ : মহালিয়া ১৩৬৬

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ : তমলুক
মেদিনীপুর

বলরাম মন্দির
৭ গিরিশ অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ৭০০ ০০৩

উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৩

মুদ্রক :
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৭০ গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৩

স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের
ষষ্ঠ অধ্যক্ষ
শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজজীর
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে
নিবেদিত

সূচীপত্র

স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ

১

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম

প্রায় দুশো বছর পরাধীনতার পর যে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের আমরা শিক্ষিত সভ্য ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং অনেক সর্বনাশের পথে হয়তো বা যার কিছুটা সুফলও আমরা ভোগ করেছি এবং করছি—ভারতে সেই শিক্ষা প্রবর্তনার পশ্চাতে প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন মেকলে সাহেব। এই মেকলে সাহেবই একদা এ রকম স্পর্ধিত উক্তি করেছিলেন যে, ইওরোপের বা ইংলণ্ডের যে কোনো কাউন্টি লাইব্রেরীর একটি তাকের বইয়ের মধ্যে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে সমগ্র প্রাচ্য মহাদেশের সব জ্ঞান-বিজ্ঞান যুক্ত করলেও তার সমান হবে না। "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না"—"সমুদ্র শাসন করছে এবং শাসন করবে ব্রিটানিয়া"—এই সব উদ্ধত উক্তির পশ্চাতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই একই উলঙ্গ দম্ভের বর্বর আত্ম-প্রকাশ। ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পশ্চাতেও ক্রিয়াশীল ছিল শাসক ও শোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই একই দম্ভ ও বিশেষ একটি দুষ্ট বুদ্ধি। সরকারী দলিল-দস্তাবেজে সেদিনকার সাম্রাজ্যবাদী সরকারের কূটনীতি ও ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত আজ ছাপার অক্ষরে স্পষ্ট হয়ে আছে। গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলে **"বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়া"** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে তাদের সুপরিকল্পিত ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তারের মাধ্যমে যথার্থ অর্থেই আমাদের বাপের নাম ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভারতবাসীদের এমনভাবে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে এরা কিছুদিনের মধ্যেই ভুলে যাবে এদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, এদের চিরপরিচিত পরিশুদ্ধ মানবিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম, পূজা-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, সব। এবং ইওরোপের অন্ধ অনুকরণ করে এরাও হয়ে উঠবে একদিন কালো সাহেব। এক কথায় একালের ভাষায় **"মগজ ধোলাইয়ের"** মাধ্যমে আমাদের স্বধর্মভ্রষ্ট

করে পরধর্মে দীক্ষিত করার চক্রান্ত পূর্ণ উদ্যমে চলেছিল প্রায় দুশো বছর ধরে। স্বধর্মভ্রষ্ট হওয়া মানেই যে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, ভয়াবহ পরধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়েই আসে সমূহ বিনষ্টি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বের প্রয়োজনেই আপাত শিক্ষা প্রসারের নামে এই চক্রান্তে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এবং এতে তারা অনেক পরিমাণে সার্থকতাও লাভ করেছিল সন্দেহ নেই। এই শিক্ষা যে কেবল কালাপাহাড "ইয়ং বেঙ্গলদের" সৃষ্টি করেছিল তাই নয়, বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল এই বিশাল বিষবৃক্ষের শিকড়-সন্নিধি। আজো সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে আমাদের আচার-ব্যবহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, ভাষায়-ভূষণে সার্বিক আমাদের জীবনাচরণে পরানুগত্য পরানুকরণের এবং স্বধর্মভ্রষ্টতার নানা বিসদৃশ, দৃষ্টিকটু, এমন কি রুচিহীন বীভৎসতা ও বিকৃতির উদাহরণ যে কোন বিচারশীল, সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং অসহ্য হয়ে উঠবে। কিন্তু স্বধর্মভ্রষ্ট, আত্মহত্যায় উদ্যত ভারতবাসীর আজ আর অদ্ভুত ভয়ানক ও বিসদৃশ ব্যাপার চোখে পড়ার মতোও অবস্থা নেই। তা না হলে আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ৪০—সেলসিয়াস গরমের মধ্যেও হ্যাট-কোট-প্যান্ট পরে, গলায় গলাবন্ধ লাগিয়ে এবং পায়ে টেরিকট-টেরিলিনের মোজা ও জুতো পরে অফিসে, আদালতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সারাদিনমান কাজ করার উন্মত্ততায় ডুবে যেতে পারতাম না। এবং এই অন্ধ উন্মাদ অনুকরণের সবচেয়ে বড শিকার হয়েছেন আমাদের দেশের তথাকথিত সংস্কৃতিবান সমাজের উচ্চ মঞ্চের অতি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের অনুসরণ করে মৃত্যুর মুখে ছুটে চলেছে সমগ্র জাতি। অথচ কোন সুস্থ স্বাভাবিক নিরপেক্ষ যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ স্বপ্নেও এদেশের পক্ষে এরকম ভয়াবহ অদ্ভুত পরিচ্ছদের কথা ভাবতে পারে না। সৌন্দর্য-তত্ত্ব, উপযোগবাদ কিংবা অন্য যে কোনো মানবিক বিচার ও মানদণ্ডে ভারতীয় নারীর শাড়ি যখন সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী-পরিচ্ছদরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং পৃথিবীর ধনী-নির্ধন বহু দেশের নারী-সমাজ কর্তৃক শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হচ্ছে, আমাদের দেশের নারী সমাজেরই এক অংশ সেখানে পরানুকরণের অন্ধ মোহে আবিষ্ট হয়ে কিম্ভূত-কিমাকার নানা বীভৎস রুচিহীন বিদেশী বেশভূষায় আপ্রাণ সজ্জিত হয়ে নিজেদের প্রকৃত প্রস্তাবে পোশাকের বিজ্ঞাপন করে তুলেছে। এসবের

পশ্চাতে সেই একই আত্মহা স্বধর্মভ্রষ্টতা। ইংরেজী শিক্ষা ও ইওরোপীয় সভ্যতার তাৎক্ষণিক রম্যতা, আপাতঃচাকচিক্য ও জলুসে আজকের মতো সেদিনও আমাদের অনেকেরই চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এমনকি বিশাল-বুদ্ধি রামমোহন পর্যন্ত বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের অপার করুণায় আমরা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসিত হচ্ছি। শুধু তাই নয়, একথাও বলেছিলেন যে, ইওরোপীয়দের সঙ্গে আমরা যত বেশী মেলামেশা করব, যত বেশী আদান প্রদান ঘটবে তাদের সঙ্গে, ততই আমরা ভদ্র সভ্য হব। ইওরোপীয় সভ্যতার এই অন্ধ মোহে আবিষ্ট হয়েই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্যন্ত সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনকে মূল্যহীন এবং পরিত্যাজ্য বলে মনে করেছিলেন এবং 'আনন্দমঠের' স্রষ্টাকেও দেখি ইংরেজ বন্দনায় মুখর হতে। অথচ ম্যাক্সমূলার, শোপেনহ্যউয়ার থেকে শুরু করে একালের উইল ডুর‍্যাণ্ড, আরনল্ড টয়েনবি পর্যন্ত পৃথিবীর বহু দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্ মনীষীবৃন্দ সকলেই ভারতের এই বেদান্তদর্শনকে বিশ্বমানবতার একমাত্র মিলনভূমি এবং সমস্ত মানবিক সমস্যাবলীর একমাত্র পরিত্রাণ বলে ঘোষণা করে গেছেন। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে এদেশ থেকে যাঁরাই ইওরোপে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই ব্রিটিশের বন্দনা এবং ইওরোপীয় সভ্যতার জয়গান করে এসেছেন। কেউ বা খ্রীষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন করে কৃতার্থ বোধ করেছেন। পরাধীন জাতির মর্মন্তুদ যন্ত্রণা ও অন্তর্জ্বালা একমাত্র বক্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট প্রত্যয়ে বিদ্রোহে ভেঙে পড়েছিল। বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী ও চিঠি-পত্র তাঁর সেই আগ্নেয় প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে এবং নব জীবনরচনার পবিত্র দায়ভাগে স্পন্দিত ও প্রতিশ্রুত।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতবাসীর স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যাভিমানের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্মরণীয়, স্বামীজীর দেহান্তর ঘটে ১৯০২ সালে। এই দুটি ঘটনাই যে পরস্পর কার্য-কারণ সম্পর্কে আযুক্ত, এতে শুধু আমার নয়, বিশ্রুত ঐতিহাসিকবৃন্দের অনেকের স্থির বিশ্বাস।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিদেশী শাসকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে (Settled Fact) শেষ পর্যন্ত উদ্বেলিত গণশক্তি কী করে ভেঙে চুরে উড়িয়ে দিয়েছিল, Unsettled করে দিয়েছিল, সে ইতিহাস আমরা

জানি। তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সেদিনকার Settled Fact-কে Unsettled করে দেবার শুরু কিন্তু কার্জন পার্কে হয়নি। আত্মমুক্তির, আত্মজাগরণের, দেশপ্রেমের এই তপস্যা শুরু হয়েছিল তার অনেক আগে থেকে। ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের স্বাদেশিকতা, স্বদেশপ্রেম ও আত্মমুক্তির দুর্মর প্রাণ-বীজ এবং জাতির শৃঙ্খলমোচনের সেই প্রথম আত্মপ্রকাশ। তাই অগ্নিকন্যা নিবেদিতা চিকাগো মহাসভার ছোট্ট কয়েকটি বক্তৃতাকে ভারতীয় জাতীয়তার মহা সনদ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। আমরা বলব—"এহো বাহ্য, আগে কহো আর।" ইংরেজী শিক্ষা ও ইওরোপীয় আত্ম-সুখ-সর্বস্ব স্বার্থপর ভোগলোলুপ সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রথম যিনি ধিক্কার উচ্চারণ করেছিলেন, ঘোষণা করেছিলেন বিদ্রোহ, তিনি হলেন পাঁচ টাকা মাইনের একজন সাধারণ পুরুত। প্রায় অশিক্ষিত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আত্মসুখ-সর্বস্ব, ভোগবাদী, স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অমানুষ বানানো আমাদের এই বর্তমান চালকলা-বাঁধা বিদ্যার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সতর্ক করে দিয়েছিলেন জাতিকে। বস্তুতঃ একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আজ অন্ততঃ আমরা বুঝতে পারব যে ইংরেজী শিক্ষার অনুবতনে বর্তমানে স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করছি—তা তো যথার্থ ই চালকলা-বাঁধা বিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মবিকাশ বা আত্মবোধ-জাগরণের, প্রীতি ও প্রেমের বিকাশের সামান্যতম কোনো প্রয়াস-প্রযোজনা নেই আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে। চিত্ত-চরিত্রের ও চেতনার বিস্ফার কিংবা আত্মশক্তি প্রস্ফুটনার কোনো উদ্যোগ নেই এই শিক্ষা-ব্যবস্থায়। শুধুমাত্র চামড়ার সুখ আর স্নায়ুর অবৈধ উত্তেজনা সংগ্রহ—অর্থাৎ শুধু নিজের জন্য ভালো খাওয়া-পরা ও থাকার উপকরণ সংগ্রহ করে সুখে থাকার প্রয়োজনেই স্বাধীনতা লাভের আটত্রিশ বছর পরেও—, এই ইংরেজী শিক্ষিত হতে এত উদ্‌গ্রীব আমরা। সর্বরকম মনুষ্যত্বহননকারী যে শিক্ষা শুধুমাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যাপৃত হতে শেখায়, ফরসা জামা-কাপড় পরে মানুষ হয়ে মানুষকে দূরে রাখতে, ঘৃণা করতে শেখায়, মানুষে মানুষে দুস্তর ব্যবধান রচনা করতে প্ররোচিত করে, দেশ-জাতি-সমাজ, বৃহত্তর জন-জীবনকে উপেক্ষা করে মানুষকে আত্মসুখপরায়ণ লোভী স্বার্থপর জীবমাত্র

হতে শেখায়, জনজাবন এবং সমাজের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে—ইতর প্রাণীর মতো শুধু চিরস্থায়ী সুখ-সংগ্রহের জন্য অন্ধ এই অচলায়তনের (Establishment), সমস্ত নীতি-বিবেক বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ করে, মনুষ্যত্বহননকারা সর্বনাশা সেই শিক্ষা-পদ্ধতি যে দেশের সমূহ সর্বনাশ সাধনে সমুদ্যত এবং পরিণামে তা চূড়ান্ত অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে জাতির জীবনে :—দক্ষিণেশ্বরেব অশিক্ষিত পুরুতই প্রথম এ সম্পর্কে জাতিকে হুঁশিয়ার কবেছেন। এই শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কারের প্রয়োজনে পরবর্তীকালে বহু শিক্ষা-সংস্কার কমিশন বসেছিল। কিন্তু সবচেয়ে আগে যে স্ব-নির্বাচিত একজনের কমিশন (self-elected one man commi-sson) এই শিক্ষা ব্যবস্থাব সামগ্রিক বিসর্জনেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন—তিনি হলেন রামকৃষ্ণ পবমহংস। পাঁচশ হাজার পৃষ্ঠার প্রতিবেদন নয়। একটি মাত্র মহাবাক্যে বিধৃত হয়ে আছে তাঁর বক্তব্য. "চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যা আমি নেব না।" (অতএব তোমরাও নিও না। নিলে সবনাশ)। এবং ইংরেজী শিক্ষাব চিরবৃক্ষে গুচ্ছ গুচ্ছ বিষফল ধরার অনেক আগেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা যুগাবতাব সচেতন বিদ্রোহে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন দেশকে, দেশেব মানুষকে। কিন্তু আমরা শুনিনি তাঁব সেই সতর্কবাণী।

২

ভারতের ইতিহাসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের তাৎপর্য

শুধু তাই নয়। ইতিহাসের চাকাই ঘুরিয়ে দিলেন ওই দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ওরা ভেবেছিল ওদের ওই বিজাতীয় শিক্ষার ফলে আমরা আমাদের পিতৃপিতামহের নাম ভুলে, পরিত্যাগ করে জাতীয় জীবনের সব মঙ্গল-কৃত্য ও কুশল কর্ম, দক্ষিণ আমেরিকার ও আফ্রিকার নানা দেশের মতো ওদের ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, এমন কি ওদের দেয়া নাম পর্যন্ত গ্রহণ করে কালো সাহেবের জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাব। চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে সনাতন শাশ্বত ভারতবর্ষ। দলে দলে আমরা ওদের আশ্রয়ে

গিয়ে ধন্য হব। কিন্তু ইতিহাস-দেবতার অঙ্গুলি হেলনে ঘটে গেল ঠিক অন্য রকম। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কামারপুকুরের এক অখ্যাত পল্লীতে জন্মলাভ করেছিলেন যে ক্ষুদ্র শিশু, ভারতবর্ষকে রক্ষা করলেন তিনি তার সমূহ বিনাশ থেকে। ধর্মান্তরিত হয়ে আমরা তো আমাদের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হই-ই নি, পরন্তু ভারত-সংস্কৃতির উদার মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ওই দম্ভী দর্পী ইওরোপীয় মানুষেরাই দলে দলে এসে আশ্রয় নিয়েছে দরিদ্র এই ব্রাহ্মণের পদতলে। বলা যায় সমস্ত পৃথিবীর সাতটি মহাদেশেব মানুষ আজ নতজানু প্রায়-অশিক্ষিত ঐ পাঁচ টাকা মাইনের পুরুতের পদপ্রান্তে। বৌদ্ধধর্মের সমস্ত পৃথিবীব্যাপ্ত বিস্তার স্মবণ করেও বলা যায় ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের ইতিবৃত্তে এমনটি আর কখনো ঘটেনি। আর কোনো দিন ভারত-ধর্ম এমন করে সাতটি (৭) মহাদেশেই ছড়িয়ে পড়েনি। এবং তাও তাঁর জন্মের মাত্র দেড়শত বছরের মধ্যে। অন্যান্য আব যে সব ধর্ম সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পরিব্যাপ্ত তাদের পশ্চাতে যেভাবে হিংস্র কুটিল রক্তাক্ত তরবারি ঝলসে উঠেছিল ও কামান-বন্দুক-বোমা বেয়নেটের অমানবিক ব্যবহার করা হয়েছিল—সে কথা এখানে অনুচ্চার্য থাক। বস্তুতঃ এ ধর্ম জীবন-ধর্ম এবং জীবনের ধর্ম, সর্ব মানুষের সার্বিক কল্যাণের ধর্ম, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য সম অধিকার প্রতিষ্ঠার ধর্ম। কারণ যুগগুরুর ঘোষণাই যে **"যত মত তত পথ"**। এবং এই সার্বভৌম মানবিক ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যই বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের বিশ্ব পরিক্রমা। এখানে এই ভারত-ধর্মে সকলের বাঁচার অধিকার, সমভাবে পৃথিবীর মাটিতে সকলের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্বাধিকার স্বীকৃত। এই ধর্মেরই অন্য নাম Practical Vedanta বা কর্ম-পরিণত বেদান্ত। এই মহৎ ধর্মের কথা স্মরণ করেই একালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক Arnold Toynbee বলেন, "ইতোমধ্যেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বিশ্ব-সভ্যতার যে অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল একদা পশ্চিমের আনুগত্যে ও আশীর্বাদে, সমূহ ধ্বংস ও আত্মবিনাশের হাত থেকে আজ মানবজাতিকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহ'লে সে অধ্যায়টি সম্পূর্ণ করতে হবে ভারতীয় আদর্শ ও জীবন-প্রত্যয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে। আর কোনো দ্বিতীয় পথ নেই। আজকের এই বর্তমান যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে বিশ্বজগৎ সংযুক্ত ও সম্মিলিত হতে পেরেছে, এত কাছাকাছি আসতে

পেয়েছে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য দক্ষতা, এই প্রযুক্তিবিদ্যা শুধুমাত্র স্থান ও কালগত দূরত্বেরই অপসারণ ঘটায়নি, পরন্তু বিশ্ব-পৃথিবীর নরনারীকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে, সকল মানুষকে একই সঙ্গে বিধ্বংসী মারণাস্ত্রেও সজ্জিত করেছে। এবং পরস্পরকে সামান্যতম ভালো না বেসে, বিন্দুমাত্র পরস্পরকে না জেনে, না জানার চেষ্টা করে, সব মানুষ সেই ভয়াল ভয়ানক অস্ত্রশস্ত্র পরস্পরের দিকে উঁচিয়ে ধরে একেবারে একান্ত সান্নিধ্যে এসে গেছে। মানব-ইতিবৃত্তের চূড়ান্ত এই সর্বনাশের মুহূর্তে, সমূহ বিনষ্টির অশুভ লগ্নে সমগ্র মানবজাতির একমাত্র মুক্তির পথ—ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুগামী হওয়া—ভারত-পন্থার অনুসরণ করা।" বলা বাহুল্য, এ মুক্তি-পথ মানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত নব বেদান্তের সর্বত্র ও সার্বিক প্রযোজনা।

ইতিহাস মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। আবার পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এরকম মানুষও আসেন যাঁরা ইতিহাস রচনা করেন, ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েও যাঁরা ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশিত করেন। এদিক থেকে যেমন গুরু, তেমনি তাঁর শিষ্য। সাম্রাজ্যবাদী সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে ভারতবর্ষ আজও বেঁচে আছে—যেমন পাঁচ হাজার বছর আগে ছিল। ভারতবর্ষ ধর্মান্তরিত হয়নি, পরন্তু সার্বিক মানবকল্যাণের প্রয়োজনে ভারতবর্ষই, শুধু ইওরোপ-আমেরিকাকে নয়, সমগ্র জগৎকে দীক্ষা দিচ্ছে নবতম প্রেমের ধর্মে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে স্বামীজী-সম্পর্কিত একটি কাহিনী: স্বামীজী তখন আলমোড়ায়। বিশ্ববিজয় করে মাত্র সদ্য ফিরেছেন আমেরিকা থেকে বিদেশী সব শিষ্য-শিষ্যা সঙ্গে নিয়ে। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের বিশ্রুত জননেতা, "ভক্তি যোগ"-প্রণেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত মশাই—তিনিও তখন বেড়াতে এসেছেন আলমোড়ায়। তিনি লোকমুখে শুনলেন সম্রাটের মতো আভিজাত্য-পূর্ণ, অসামান্য রূপলাবণ্যময় দেবোপম দীর্ঘকান্তি এক পুরুষ সন্ন্যাসীর বেশে ঘোড়ায় চড়ে নাকি সকাল-সন্ধ্যায় সমগ্র শহর পরিক্রমা করেন। কৌতূহলী হয়ে একদিন তিনিও অনুসরণ করলেন লোকশ্রুত উক্ত সন্ন্যাসীকে—তাঁর নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখলেন সন্ন্যাসীর ঘোড়া একটি আশ্রমে প্রবেশ করতেই—কয়েকজন সাহেব ও মেম দৌড়ে এসে কেউ ঘোড়ার লাগাম ধরছেন, কেউ স্বামীজীকে ঘোড়া

থেকে নেমে আসতে সাহায্য করছেন—কেউ বা চেয়ার পেতে দিচ্ছেন লনের মাঝখানে, কেউ হাওয়া করছেন—আর দু'জন সাহেব মেম বুট-জুতো শুদ্ধ স্বামীজীর পা দু'টি কোলে তুলে নিয়ে জুতোর ফিতে খুলে দিচ্ছেন। বিস্ময়ে বিস্ফারিত মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত মশাই জনান্তিকে মন্তব্য করলেন—আমরা এর বিপরীত চিত্রই তো দেখতে অভ্যস্ত। সাহেবও যে বাঙালীর, ভারতবাসীর জুতো খুলে দেয়—এ ঘটনা অভিনব এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এবং আরো ঘোষণা করলেন: বুঝতে পারছি—ভারতের স্বাধীনতা প্রত্যাসন্ন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের আজকের সমাজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে আমাদের দেশের—তা সম্ভব হয়েছে স্বামীজীর তপস্যার ফলেই। ভারতবর্ষকে তিনিই প্রথম আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভারতবর্ষকে তার স্বধর্মে। নিজেকে, নিজের দেশকে তিনিই প্রথম আমাদের চিনতে শিখিয়েছেন। এই আত্মসম্ভ্রমবোধ, আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-আবিষ্কার, এ সবই তাঁর দান। জাতিকে আহ্বান করে স্বামীজী বলেছিলেন: আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন আমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোনো ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি। তিনি আরো বলেছিলেন India should be freed politically first. বস্তুতঃ তাঁর এই পূর্বোক্ত ঘোষণার ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। এ শুধু মাত্র ভবিষ্যদবাণী নয়, এর পশ্চাতে রয়েছে সুগভীর কার্য-কারণ-সম্পর্কের স্থির ভিত্তিভূমি।

৩

দুই দত্ত: নরেন দত্ত এবং মধুসূদন দত্ত

নরেন দত্তের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খুব স্বভাবতঃই আর এক দত্তের কথা আমাদের মনে পড়ে। নরেন দত্তের প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ও বাণীর প্রসঙ্গ। বহুবার বহু জায়গায় স্বামীজী তাঁর রচনাবলীতে চিঠিপত্রে কবি মাইকেল প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন। অথচ আশ্চর্যের

কথা ব্যক্তিগত জীবনে দুজনে কিন্তু দুই বিপরীত প্রান্তের মানুষ। একজন সর্বত্যাগী দার্শনিক যোগী-সন্ন্যাসী। বৈরাগী, কপর্দকশূন্য পরিব্রাজক। আর অন্যজন ভোগী, আজীবন ঐশ্বর্যে লালিত এবং 'নাম-খ্যাতি-ঐশ্বর্যের' অভিমুখী যাঁর সমগ্র জীবনযাত্রা। মদ্যপানাসক্ত উচ্ছৃঙ্খল যাঁর প্রত্যহ দিনচর্যা। কিন্তু পরিশুদ্ধ উজ্জ্বল অমল কবি-প্রতিভায় অসামান্য, অসাধারণ এবং আর এক জায়গায়ও দুজনের আশ্চর্য মিল। পরাধীন ভারতের বিপন্ন বন্ধনে দুজনেই যন্ত্রণাবিদ্ধ। দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের স্বপ্নে দুজনেই অতন্দ্র কোজাগর। বস্তুতঃ **'মেঘনাদবধ কাব্য'** জাতির আত্ম-আবিষ্কার, আত্মপ্রবোধনের গান। "মেঘনাদবধ কাব্য" পরপদানত, পরাধীন জাতির আত্মবন্দনা, অনিবার্য আত্ম-উন্মীলনের মহাসঙ্গীত। নায়ক মেঘনাদের কণ্ঠে আমরা যখন শুনি :··· "হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে / কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে? / কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে / করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে ; / যায় কি সে কভু, পঙ্কিল সলিলে, / শৈবাল দলের ধাম? মৃগেন্দ্রকেশরী, / কবে, হে বীর কেশরি, সম্ভাষে শৃগালে / মিত্রভাবে?" তখন মনে হয় পরানুকরণপ্রিয়, পরপদানত, আত্মভ্রষ্ট, ভীরু দুর্বল অসহায় জাতির অকারণ ব্রিটিশ রাজশক্তির তোষণ ও লোভী আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে এ যেন মহাকবিরই নিজস্ব কণ্ঠস্বর। কিংবা প্রমীলা যখন বলেন—'রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী, / আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে—?" তখনও আমরা বুঝতে পারি জাতীয় মহাকবির কণ্ঠে এ হল আত্ম-জাগরণের, আত্ম-উজ্জীবনের দিব্য গাঁথা। কিংবা মেঘনাদের কণ্ঠে যখন শুনি : "হায়, তাত, উচিত কি তব / এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী, সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলী শম্ভুনিভ / কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী? / নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে? /চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?"—কিংবা বিভীষণ নিজেকে 'রাঘবের দাস' বলে নিজের পরিচয় দিলে মেঘনাদ যখন উচ্চারণ করেন : 'হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে! / রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে/আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে! / স্থাপিলে বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে; / পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি / ধূলায়?" তখন দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন, আত্মসম্মানহীন, ব্রিটিশের পদলেহী পরাধীন ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যেই মেঘনাদের আড়ালে থেকে কবি যেন নিজেই

দুঃসহ অভিমানে লজ্জায় বেদনায় ক্ষোভে, মনে হয়, এই ধিক্‌কারবাণী ঘোষণা করেছেন। পরাধীন ভারতবাসীর উজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার স্মরণ করিয়ে দিয়ে—জাতিকে আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ করে এভাবে ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ করেছেন কবি। একজন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কবি-প্রতিভার অমোঘ দর্পণে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের বিদ্রোহ-ব্যথা আর তার নিরুপায় অথচ অন্তহীন মর্মজ্বালা। কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে যেন যোগ নেই সেই শুদ্ধ কাব্য-চেতনার ও কবি-কল্পনার, সেই আকাশমুখী অমল দেশাত্মবোধের, সেই বিনম্র নতজানু অশ্রুসজল দেশপ্রেমের। ঠাকুর-স্বামীজীর মতো কর্মে ও কথায় কোনো আত্মীয়তা অর্জন করতে পারেন নি কবি। খুঁজে পান নি জীবনে জীবন যোগ করার অভিজ্ঞান। অর্থাৎ কোনো কর্মযোগে যুক্ত হয়নি তাঁর দেশপ্রেমের দৃপ্ত অনুভব। আর নরেন দত্ত শুধুমাত্র কল্পনায় বা হৃদয়ের অনুভবে নয়, বেদনার অশ্রুজলে ক্ষণিকের তর্পণ-ক্রিয়ায় নয়, পরন্তু সমগ্র জীবন-যৌবন-ধন-মান সমস্ত কিছু উৎসর্গ করে গেছেন জাতির আত্মজাগরণের সার্বিক প্রয়োজনে—পরম পূজ্য দেশজননীর চরণতলে। স্বামীজীর সমগ্র বাণী ও রচনা এবং জীবনব্যাপী সমগ্র তাঁর কর্ম-প্রয়াস, সবই যেন একটি জাতির সর্বাত্মক উদ্বোধনের, সার্বিক জন-জাগরণের দিগ্বিজয়ী রণ-গীতি—দেশজননীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ঊর্ধ্বায়িত উজ্জ্বল হোমশিখা, অনির্বাণ শঙ্খ-ঘণ্টা-প্রধ্বনিত পুণ্য-পবিত্র স্তোত্রমালা।

৪

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যাভিমান

ভারত-কন্যা নিবেদিতা তাই নিজের গুরুদেব সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন : "ভারতের চিন্তাই ছিল তাঁহার ধ্যানজ্ঞান।" "যে মুহূর্তে আমি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, যেই মুহূর্ত হইতে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে আর এক অগ্নির নিরন্তর দহন জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি ; সে কোনো তত্ত্ব, কোনো আধ্যাত্মিক সত্যের উপাসনা বা উন্মাদনা নয়—দেশ জাতির দুর্দশা নিবারণের প্রাণান্ত প্রয়াস ও তাহার

নিষ্ফলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনাভোগ"। "The queen of his adoration was his Motherland". "India was his daydream, India was his nightmare". বিবেকবাণীর মধ্যেও শিষ্যা-কথিত এই সাক্ষ্য বার বার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও তিনি বলতে পারেন: "আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা-দেবী হন। অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোনো ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি।" আবার বলছেন: "তবু স্বাধীনতা এক জিনিস; গোলামি আর এক...স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষ গুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই।" ইংরেজ-রাজ সম্পর্কে তাঁর নির্ভীক সত্যভাষণ এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে: ...ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে, আর এদেশের কোটী কোটী টাকা নিজেদের দেশে চালান করেছে। প্রায় নব্বই বছর আগে স্বামীজী যে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ভারতশোষণের চিত্র তুলে ধরেছিলেন, আটত্রিশ বছর স্বাধীনতার পরেও সে চিত্র খুব বেশী পালটায় নি। বিদেশী রাজশক্তির রাজদণ্ড আজ বণিকের মানদণ্ডরূপে আবার পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও প্রচ্ছন্নভাবে তাদের শোষণ ও আমাদের উপর পেষণক্রিয়া ঠিক সমভাবে না হলেও অনেকটাই যে চলেছে তাতে সন্দেহ নেই। দেশী ও বিদেশী বণিক একযোগে দরিদ্র দুঃস্থ জনসাধারণকে আজো পেষণ ও শোষণ দুই-ই করে যাচ্ছে। সুতরাং বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা আজো আমাদের কাছে সমভাবে শুধু বর্তমান তাই নয়, তাঁর পথ-নির্দেশ আজ এই অবক্ষয়ের অন্ধকারে একান্ত অপরিহার্য। স্বামীজী বলেছিলেন, "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া"। কিন্তু পরস্বাপহারীদের কি সত্যিকার অর্থে আজো আমরা তাড়িয়ে দিতে পেরেছি? না, কোনো অর্থেই তা আমরা পারিনি। বরং যে ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসে রেখে গেছে শুধু "স্তূপীকৃত ভাঙা ব্রাণ্ডির বোতল আর কিছু নয়"—তারা আজো বহাল

ভবিষ্যতে রয়ে গেছে এবং ভারতের মাটিতেই আবার বণিকের মানদণ্ড গ্রহণ করে প্রচ্ছন্ন পথে আরো পাকাপোক্তভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের শোষণ ও পেষণক্রিয়া। এবং তাদের রাজা-রানীকে স্বাগত জানাতে অসহায় অন্ধ আমরা আজো উন্মাদের মতো ছুটে চলি কাতারে কাতারে। অথচ তা কিন্তু কথা ছিল না—; অন্ততঃ স্বামীজীর কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল অন্যরকম। প্রতারক পরস্বাপহারীদের সত্যিকার তাড়িয়ে দিতে পারলে এদেশের চেহারা হতো অন্যরকম।

আমাদের শাস্ত্রে আছে একটি কথা—"আত্মানং বিদ্ধি"। বেদান্তের আধ্যাত্মিক অর্থে নয়, বৃহত্তর সমাজ-চেতনার তাৎপর্যে মণ্ডিত একটি নতুন মাত্রা যোগ করে উক্ত শব্দগুচ্ছ দ্বারা সমগ্র দেশ ও জাতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি চেয়েছিলেন—স্বামীজী আমাদের কাছে—তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে। তাঁর বক্তৃতায়, রচনায়, চিঠিপত্রে নানাভাবে এই একটি কথাই তিনি বার বার যেন আমাদের বলে গেছেন: নিজেকে জানো, নিজের দেশকে জানো—নিজের দেশের মানুষকে প্রীতির চক্ষে ছাখো—; তাদের সবাইকে ভালোবাসো। বিশাল ভারতবর্ষের মহিমময় ঐতিহ্য; তার মহান সংস্কৃতির সঙ্গে দেশের মানুষের পরিচয় ঘটুক—স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছিলেন। কারণ দেশকে না চিনলে, না জানলে তাকে ভালোবাসবো কেমন করে? তাই প্রাচীন ভারতবর্ষের উজ্জ্বল চিত্রটি বার বার তুলে ধরেছেন জাতির সম্মুখে: "শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে দণ্ডায়মান। সে শোভাযাত্রার কোনো কোনো অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণ তেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রানীর মতো পদবিক্ষেপে পশু-মানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ-মর্ত্যের কোনো শক্তির সাধ্য নেই—এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে!" ভারতবর্ষের অতীতের উজ্জ্বল রূপচিত্রাবলী এরকম বার বার আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছেন স্বামীজী। মেঘনাদের কণ্ঠে মাইকেলের মতো স্বামীজীও যেন জাতিকে বার বার সচেতন করে দিয়ে বলছেন, "কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে? কে বা সে অধম রাম?" আত্মসম্ভ্রমবোধহীন পরপদানত পরাধীন ভারতবাসীকে এখানে বিভীষণ এবং

অত্যাচারী শোষক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তিকে রামের রূপকে উপস্থাপিত করে পরাধীন ভারতের মর্মরালোকে ব্যক্ত করা হয়েছে। যে পররাজ্যলোলুপ লুণ্ঠনব্যবসায়ী বণিক ব্রিটিশ-রাজশক্তির কাছে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত আমরা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে বসে আছি এবং হীন ক্রীতদাসের মতো যার স্তাবকতা ও তোষণ করছি, আত্মসম্মানহীন পশুর মতো যার পদলেহন করতে ছুটে চলেছি, এবং যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি এক অন্ধ সর্বনাশা মোহে প্রতিমুহূর্তে আত্মবিক্রয় করছি আর আত্মহননে উদ্যত হয়েছি আমরা, ভোগবাদী সেই সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিলেন স্বামীজী আমাদের কাছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি-পরাধীন আমাদের এই সুপ্রাচীন মহান ভারতসভ্যতা-সংস্কৃতির সত্য পরিচয় এবং পরিপূর্ণ রূপটিও অনন্য মমতায়, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন স্বামীজী। দম্ভী দর্পী ভোগসর্বস্ব জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে, বিশেষ করে ইংরেজদের লক্ষ্য করে বললেন—হিংসা লোভ আর পরস্বাপহরণ ছাড়া আর কী আছে তোমাদের? এমন একটি দেশের নাম করো তো তোমরা যেখানে শাঠ্য-প্রতারণা-ষড়যন্ত্র এবং গোলা-বারুদ-কামান-বন্দুক ছাড়া, লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন না করে, নিরপরাধ অসহায়ের রক্ত না ঝরিয়ে—, তোমাদের খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছে! "ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হল তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নট ও ব্রাণ্ডি। এবং এরই নাম সভ্যতা! এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেন্ট-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে।" আরো বললেন:…মাত্র চারশত বৎসর পূর্বে ইংরেজ জাতি অসভ্য ছিল। এখনও তাহারা সম্পূর্ণ সভ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা অসভ্য এবং বন্য। হত্যা তাহাদের পেশা, লুণ্ঠন তাহাদের জীবিকা, শোষণ তাহাদের ধর্ম।…ইংরেজদের মানব-প্রেম মুখের কথা মাত্র, তাহাদের অন্তঃকরণে হিংসা, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছুই নাই। অন্য জাতির মানুষকে তাহারা মুখে বলিয়া থাকে—ভাই, আমরা তোমাদের ভালোবাসি, কিন্তু সব সময়ই তাহারা উহাদের গলা কাটিবার জন্য ব্যগ্র। ইংরেজের হাত তাই অন্য জাতির শোণিতে লাল। তোমরা বলছ তোমাদের সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না—কিন্তু কোন অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে, কোন অমানবিক পাশব পন্থার নির্মম অনুবর্তনে তা সম্ভব হয়েছে

তা কি অজানা তোমাদের? শুধু মাত্র শাঠ্য-ষড়যন্ত্র আর গায়ের জোরে কোটী কোটী মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছ তোমরা। হিংসা আর হননের পথে লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষকে খুন করে—তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে, তাদের রক্তে হোলি খেলে, কোটী কোটী নর-নারীর উপর নির্মম অত্যাচার ও হিংস্র নিপীড়ন চালিয়ে তোমাদের সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এই পাশব সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা আবার গৌরব করো?:—এরকম অজস্র বাক্যাবলী খুঁজে পাওয়া যাবে স্বামীজীর রচনা ও পত্রাবলীতে। এ-প্রসঙ্গে মিস মেরী হেলকে লিখিত একটি পত্র (বাণী ও রচনা অষ্টম খণ্ড—৭০-৭২ পৃঃ) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ঐ চিঠিতে স্বামীজী ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের নির্মম পাশবিক দমননীতি, চূড়ান্ত তাদের অপদার্থতা ও অক্ষমতা এবং সর্বোপরি ঘৃণ্য স্বার্থান্বেষী ভয়াবহ অর্থনৈতিক শোষণ ও পেষণের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের যথার্থ রূপটি অনাবৃত করে ধরেছেন। পত্রখানির প্রতিটি ছত্রে পরাধীন ভারতবর্ষের গভীর অন্তর্জ্বালা আর ব্যর্থতার গ্লানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। "Press Act, Arms Act, পুনা প্লেগ দমনে সরকারী অত্যাচার ও নারীর শ্লীলতা হানি, মহামান্য তিলকের কারাবরণ, লর্ড কার্জনের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি ও কলকাতা কর্পোরেশন আইন: ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অংশের দুর্ভিক্ষ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি সরকারী হিংস্র নীতি—এ সবের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে স্বামীজীর ঐ চিঠিতে।" চিঠিটি সমকালে প্রকাশিত হলে স্বামীজীকে অবশ্যই ব্রিটিশ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হতো সন্দেহ নেই। অথচ সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করবেন স্বামীজী তাঁর রচনাবলীর কোথাও সরাসরি ইংরেজবিদ্বেষ প্রচার করেন নি—যদিচ স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্যের কথা বার বার অগ্নিগর্ভ ভাষায় উচ্চারণ করে গেছেন। ব্রহ্মে স্থিত একজন সন্ন্যাসীর তো কেউ শত্রু নেই, কারো সঙ্গে তো বিদ্বেষ থাকতে পারে না তাঁর। তাই স্বাভাবিক ভাবেই স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে 'জাতিবৈর'-এর কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ এই ভূখণ্ডের কয়েক কোটী দরিদ্র নিঃস্ব নিপীড়িত নির্যাতিত নর-নারীর সর্বাত্মক কল্যাণ ও বন্ধনমুক্তির প্রয়োজনেই স্বামীজীর এই স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ।

অবশ্য ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে লক্ষ্য করেই স্বামীজী একথাও বলছেন: পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন একজন রাজা বা নরপতির নামও করতে পারবে না তোমরা—অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে—যিনি পররাজ্য গ্রাস করে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ, আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি এবং ধর্মও এককালে দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিল এবং দিগ্বিজয় করেও এসেছে। তবে সে দিগ্বিজয় অস্ত্রের ঝনৎকারে নয়, কামান-বন্দুকের গর্জনে নয়—পাশব অভিঘাতের সহায়তায় নয়। সে দিগ্বিজয় সম্পাদিত হয়েছিল প্রেমের দ্বারা, ভালোবাসা ও প্রীতির বন্ধনে মানুষকে বুকে বেঁধে। ত্যাগ ও সেবার গৈরিক পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে আমরা স্থাপন করেছিলাম দূরে দূরান্তরে আমাদের প্রেমের পবিত্র সাম্রাজ্য। এবং মৃত্যুহীন সেই স্বর্ণ-সাম্রাজ্যের পরমায়ু।—এবং আমরা মনে করি সে দিগ্বিজয়ের ধারা আজো অব্যাহত। এবং আমাদের শেষ দিগ্বিজয় ঘটেছে অতি সাম্প্রতিক কালে; ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বরে চিকাগো ধর্মমহাসভাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল সেই মহান রক্তপাতহীন দিগ্বিজয় এবং আজো এগিয়ে চলেছে সেই দিগ্বিজয় দেশ থেকে দেশান্তরে। স্বামীজীর নিজের অনবদ্য ভাষায় এই দিগ্বিজয়ের স্বরূপটি এখানে উন্মোচিত করা যেতে পারে: "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ-সহায়ে।" মানুষের রক্তপাতে, অস্ত্রের ঝনৎকারে, পশুশক্তির আস্ফালনে এ দিগ্বিজয় নয়। কারণ ভারত-ইতিহাসে পররাজ্য-লোলুপতার, পরদ্রব্যলুণ্ঠনের এরকম কোনো কলঙ্কজনক অধ্যায় নেই—যেখানে ভারতের একজন রাজা-সেনাপতিও অস্ত্রের সাহায্যে বেরিয়েছিলেন পররাজ্য গ্রাস করে নিতে। ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি, উজ্জ্বল বিশ্বৈক্যবোধ, পরিশুদ্ধ মানবতাবাদ এবং সর্বমানুষের কল্যাণসাধনাই তাঁর দিগ্বিজয়ের একক হাতিয়ার। অতীতের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে, তবে এবারে শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখণ্ডগুলি মাত্র নয়, ভারত বের হয়েছে এবারে সমগ্র বিশ্ববিজয়ে। তাই স্বামীজী নিজেই ঘোষণা করলেন: আমি আমার কর্মযোগ—আমার এই কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত হব না। সর্বত্র মানুষকে আমি উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করে যাব—যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র পৃথিবী—

এই বিশ্বজগৎ জানতে পারবে যে সে ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত।

চিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এখানে একজন ঐতিহাসিকের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "আমেরিকায় স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ীর সম্মানলাভ এবং বহির্বিশ্বে স্বামীজীর প্রচারকার্য জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই নয়, পরন্তু জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি যুগান্তর। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে: বিদেশে বেদান্ত প্রচার করে কিভাবে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে অথবা বিদেশে বেদান্ত প্রচারের কি সার্থকতা? দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে—প্রথমতঃ, ইংরেজ শাসনে দেশ স্থবির, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট—দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিদ্যমান, জনমানসে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বীর্যবত্তা—সব কিছু সম্পর্কেই একটা হীনমন্যতা বিদ্যমান; দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের অপপ্রচারের ফলে বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত—বিদেশীর চোখে ভারত তখন বর্বরের দেশ, এবং তাদের ধারণা ইংরেজের আগমনের ফলেই ভারতে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় ভারত যদি স্বাধীনতা চায় তবে সে নিশ্চয়ই বিশ্বের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে অথচ যা যে কোনো মুক্তিকামী জাতির পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং এমতাবস্থায় বিশ্বের সহানুভূতি লাভের জন্য বিদেশে ভারতের ঐতিহ্যশালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারের প্রয়োজন ছিল। বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় এধরনের অনেক নজির মিলবে। বিদেশে বিবেকানন্দের কীর্তি ভারতবাসীকে দিল আত্মগৌরব, ঐক্যবোধ এবং আত্মপ্রত্যয়, সুদৃঢ় হল জাতীয়তাবোধের ভিত্তি, প্রাণবন্ত হল দেশপ্রেম। বিদেশেও ভারত সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হল।" (চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ-গ্রন্থে জীবন মুখোপাধ্যায়ের "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

৫

ভারত সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রসঙ্গে স্বামীজী

অতঃপর আমাদের মহান ভারত সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করে মদগর্বী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে লক্ষ্য করে স্বামীজী আরো বললেন: তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যখন উলঙ্গ হয়ে কাঁচা পশু-মাংস খেয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে আরণ্যক জীবন যাপন করতো, পশুর মতো ঘুরে বেড়াতো—আমরা, আমাদের পূর্বসূরীরা তখন শুধু বেদ-বেদান্ত, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, শিল্প-কলাবিদ্যাই নয়,—উচ্চতম গণিত, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, বীজগণিত, মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, অণুবাদ, কোয়ান্টাম, বলবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি সমূহ জ্ঞানরাশির নানাদিক নিয়ে গবেষণা করে সমাজবদ্ধ অতি সুসভ্য জাতিরূপে এই পৃথিবীর মাটিতে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজী আরো বললেন: "তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। সার উইলিয়ম হান্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরো বেশী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়-গৌরব-স্বরূপ মিশ্র গণিত ইহাদের সবগুলিই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়। বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর-স্বরূপ সংখ্যাদশকও ভারতমনীষার সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (Decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ। দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনো পর্যন্ত অপর যে কোনো জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রহিয়াছি।......সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইওরোপে উহা প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার

ভিত্তি।……সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য ও নাটক অপর যে কোনো ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য। "ঈসপস্ ফেবলস্" নামক প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান,……"অ্যারেবিয়ান নাইট্স্" নামক বিখ্যাত কথাসাহিত্য এমন কি "সিণ্ডারেলা ও বরবটির ডাঁটা" গল্পেরও উৎপত্তি ভারতেই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রং উৎপাদন করে এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজী "সুগার" কথাটি সংস্কৃত শর্করা হইতে উৎপন্ন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দাবা, তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুত সব দিক দিয়া ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইওরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইতে থাকে।" এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে অতঃপর স্বামী প্রভানন্দ "চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ" গ্রন্থে তাঁর "ভারত সংস্কৃতিতে স্বামীজীর দান"—প্রবন্ধে লিখেছেন: "এভাবে ভারতবর্ষেব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাব-সম্পদের সন্ধান, আবিষ্কার ও প্রচার করে স্বামীজী আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত দেশবাসীর অবসাদমুক্তি দিয়েছিলেন, স্বদেশকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশবাসীর অন্তরে। তিনি জাতির চিত্ত হতে জড়তা ভীরুতা দুর্বলতা দূর করে দেশবাসীর আত্মশক্তির উদ্বোধন করেছিলেন। স্বামীজীর কণ্ঠে উদ্গত জাগরণের মন্ত্র জাতির মেরুদণ্ডে এনেছিল স্বাজাত্যাভিমানের শিহরণ। স্বদেশপ্রত্যাগত স্বামীজী কলোম্বতে প্রথম বক্তৃতাতেই আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন: "আগে আগে আমি ভাবতাম যে ভারত পুণ্যভূমি, আজ আমি আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।"

৬

সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির অনন্য রূপকার স্বামী বিবেকানন্দ

কিন্তু স্বদেশের ও আত্মসংস্কৃতির প্রশস্তিতেই শেষ হয়নি স্বামীজীর বক্তব্য। তিনি আমাদের জাতীয় চরিত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমাদেরই পরিশোধনের জন্য।

অনেক ভর্ৎসনাও করেছেন স্বদেশবাসীকে ঐ একই কারণে। বললেন: "ইংরেজ জাতির সঙ্গে তোমাদেব এত প্রভেদ কিসে?...প্রভেদ এই, ইংরেজ নিজের উপর বিশ্বাসী, তোমরা বিশ্বাসী নও। ইংরেজ বিশ্বাস করে—সে যখন ইংরেজ, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।...তোমাদিগকে লোকে বলিয়া আসিতেছে ও শিক্ষা দিতেছে যে, তোমাদের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই—কাজেই—তোমরা অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছ। অতএব আত্মবিশ্বাসী হও।" পুনর্বার বললেন: "যাহা যবনদিগের ছিল, যাহা অবলম্বনে ইওরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই।...চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি-তৃষ্ণা: চাই সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

এসব কথাই তিনি বলেছেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মাতৃভূমির সর্বাত্মক উন্নতি ও প্রগতি, চেয়েছিলেন তাঁর দেশ, তাঁর স্বদেশবাসী অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করুক—এবং তাদের স্বাধিকার ছিনিয়ে আনুক। এবং তারপর সকলের সর্বাত্মক বন্ধন মুক্তির পথে তাদের অভিযাত্রা সার্থক ও সম্পন্ন হোক। পরবর্তীকালে আমাদের কবিকণ্ঠে ছন্দোবদ্ধ হয়ে যে কথা উচ্চারিত হয়েছিল, স্বামীজী তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনার মধ্য দিয়ে সমগ্র জীবন-যৌবন-ধন-মান দেশজননীর চরণতলে উৎসর্গ করে—এই সত্যটিকে ভারতের মাটিতে বাস্তবরূপ দিতে, বার বার নানাভাবে এই ভাবটিকেই জাতির হৃদয়ের মর্মমূলে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। আমার মনে হয়—কর্মযোগে সর্ব-সমর্পিত আমাদের মহাযোগীর মহান জীবনাদর্শটিই আমাদের মহাকবির কণ্ঠে শ্রেষ্ঠ কাব্যবাণীরূপে উৎসারিত হয়েছিল:

"মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত—সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।......"

এই কবিতা রচনার বহুপূর্বেই স্বামীজীর বক্তৃতাবলী ও পত্রগুচ্ছে এই একই কথা, একই জাগরণী নানা সুরে নানাভাবে আমরা শুনেছি। এবং তাঁর সমগ্র জীবনের কর্ম-প্রযোজনার মধ্য দিয়েও জাতীয় জীবনে গণ-উত্থান ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বার বার জাতিকে আহ্বান করে বলেছেন, ওঠো, জাগো। সব জড়তা ঝেড়ে ফেলে অটল আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলো। বললেন: "হে বীর যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস করো যে, তোমরা বড় বড কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ-ঘেউ-ডাকে ভয় পেও না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেও না—খাড়া হয়ে ওঠো, ওঠো কাজ করো।" এই তাঁর আদেশ। এই তাঁর উপদেশ। কারণ তিনি জানতেন এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা সম্বল করে কেউ বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। তাই মৃতপ্রায় হতাশাগ্রস্ত জাতির কর্ণে শুনিয়েছেন আত্মপ্রবোধনের মহামন্ত্র। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সেই সিংহ আর মেষ-শাবকের বহু-প্রচলিত গল্পটি এখানে স্মরণীয়: আসন্ন-প্রসবা এক সিংহী ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল এক মেষের দলে শিকারের লোভে। এবং সেখানেই ভূমিষ্ঠ হল তার একটি শাবক। রাখালদের সমবেত আক্রমণে অতঃপর নিহত হল সেই সিংহী। এদিকে সেই সিংহশাবক মেষের পালের সঙ্গেই বড হয়ে উঠতে লাগল। এবং মেষের দলে থেকে থেকে ক্রমে মেষের আচার-আচরণই সে শিখল। মেষেদের জীবন-পদ্ধতিতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠল। মেষেদের মতোই ঘাস-পাতা খায়, এমন কি গর্জন ভুলে গিয়ে তাদের মতোই ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাকে। কিছুদিন পরে শিকার-প্রত্যাশী আর এক সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মেষের পালেই পুনর্বার। সিংহের গর্জনে মেষের দলের সঙ্গে সিংহ-শিশুও লেজ গুটিয়ে পালাতে গেল। আক্রমণকারী সিংহ মেষের পালে নিজেরই জাত-ভাইকে দেখে আশ্চর্য। ঘাড ধরে তাকে সে টেনে নিয়ে এল এক জলাশয়ের কাছে। সে তখন বড় সিংহের থাবার নীচে ভয়ে থরথর্ করে কাঁপছে। বড় সিংহ তখন বলল তাকে: ছ্যাখ, ভালো করে নিজের মুখ চেয়ে ছ্যাখ দেখি! কে তুই জানিস? চিনতে পারছিস নিজেকে? —আমিও যা—তুইও তাই। ডাক দেখি এরকম চিৎকার করে! বড় সিংহ আকাশ

কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল। এবং জলাশয়ে আত্মমুখ দেখে সিংহের সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে মেষের পালের সিংহ-শিশুর মনেও ফিরে এল আত্মবিশ্বাস। সত্যিকার সে চিনতে পারল নিজেকে। সেও গর্জন করে উঠল তখন। বড় সিংহ অর্ধ-মৃত শিকার ফেলে দিল তার মুখের কাছে। নে, খা। ছোট সিংহ, আত্মবিস্মৃত সিংহ-শাবক সেই প্রথম রক্ত-স্বাদ গ্রহণ করল। এবং বীর-বিক্রমে শিকার মুখে বড সিংহের সঙ্গে ঊর্ধ্বে লাঙুল তুলে উদ্দাম অরণ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তিটি :

"Sinners? It is a sin to call a man so, it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, a shake off the delusion that you are sheep." তুমি মেষ নও, তুমি মানুষ—এই আত্মবিশ্বাসের মহামন্ত্র দিলেন তিনি জাতিকে সর্বপ্রথম। অবক্ষয়ের অন্তহীন অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত পরানুকরণপ্রিয় ভীরু দুর্বল পরমুখাপেক্ষী অসহায় স্বধর্মভ্রষ্ট আত্মসম্ভ্রমহীন জাতিকে তার আত্মমুখ দেখানোর সাধনাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের। ক্লীবতা, কাপুরুষতা, হীনম্মন্যতা দূর করে হৃদয়ে আবার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া। বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়েই এই আত্মপ্রবোধনের উদ্বোধনী সংগীত ও জীবনব্যাপী তাঁর সমগ্র কর্মপ্রয়াস ঐ একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। জাতির সর্বাত্মক জাগরণের জন্য সবচেয়ে আগে চাই আত্মবিশ্বাস। অথচ আটত্রিশ বছর স্বাধীনতা লাভের পরও আমাদের 'পরানুকরণ-প্রবৃত্তি ঘুচল না। প্রতিষ্ঠিত হতে পারলাম না—আত্মবিশ্বাসের স্থির ভূমিতে। খুঁজে পাচ্ছি না যেন আজো আমাদের সত্যিকারের স্বধর্মকে। এখানেই বর্তমান সমাজেও স্বামীজীর বাণীর সমান প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান। অন্ধ সাহেবপ্রীতি, যা কিছু বিদেশী তার প্রসঙ্গে দুর্বার মোহ, এসব তো আজো—ঘুচল না। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষের অনুসন্ধান আজো স্বামীজীর কালের মতোই সমান কাম্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের, প্রতিষ্ঠার কথা আজো দেশের মানুষকে শোনানো ও বোঝানোর সমান প্রয়োজন আছে। জাতির কাছে তার উজ্জ্বল অতীত তুলে ধরতে হবে ভবিষ্যৎ রচনার জন্যই।

৭

কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী সভ্যতার সমন্বয় এবং ভারতের নবজাগরণ

সভ্যতাব যদি দুটি দিক মনে করি, তবে একটি তার কাত্যায়নী সভ্যতা এবং অপরটিকে বলতে পারি মৈত্রেয়ী সভ্যতা। পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হলে এই দুয়েরই সমান প্রয়োজন। এই যে নানা দিক থেকে অজস্র সব উপকরণ সংগ্রহ করে, নানাভাবে বস্তুসম্ভার সৃষ্টি করে, সুখে শান্তিতে আরামে বেঁচে থাকার প্রয়াস :—এই যে কলকারখানা, ট্রেন-বাস, জাহাজ, এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, আগ্নেয়াস্ত্র, আণবিক আবিষ্কার, রঞ্জনরশ্মি, ঔষধপত্র, নানা ধরণের খাদ্য-পানীয় দ্রব্য, রেডিও-টেলিভিশন, প্রসাধন, আলো-পাখা-বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমৃদ্ধ জীবনযাপনের আরো নানা বস্তুসম্ভার—এসবই কাত্যায়নী সভ্যতার অবদান। অবশ্যই জীবনধর্মের সুষ্ঠু অধিবাসনায় এসবেরই প্রয়োজন আছে। স্বামীজী জীবন রচনার এসব কর্ম-প্রয়াসকে বলেছেন বহিঃ প্রকৃতি জয়ের তপশ্চর্যা। কিন্তু শুধুই বহিঃপ্রকৃতি জয় করলেই চলবে না। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের অন্তরের অন্তঃপ্রকৃতির উপরও। নিজের চিত্তই যদি আমার বশীভূত না হল তো এসব পৃথিবীর ভোগসামগ্রী ভোগ করবে কে? গুরুর সেই অমোঘ উক্তি **"খালি পেটে ধর্ম হয় না"**—এ যুগে এবং সব যুগেই যেমন স্থির সত্য, তেমনি আবার অবিরাম বস্তু সঞ্চয়ের মধ্যেও স্থায়ী সুখ নেই।—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্": যাতে আমি অমৃতত্ব পাবোনা, তা দিয়ে কী হবে আমার?—এই হল মৈত্রেয়ী সভ্যতার শাশ্বত বিজয়ী ঘোষণা। মনে পড়ে বালক নচিকেতার সেই বিখ্যাত উক্তি:—"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো": শুধুমাত্র বিত্তে, বস্তুলাভে তো মানুষের তৃপ্তি নেই। আরো কিছু চাই তার। "লাখ লাখ যুগ···হিয়ে হিয় রাখলুঁ—তবহুঁ হিয়া জুড়ন না গেল" —তার যে ভুমার আকাঙ্ক্ষা। এই সব হলো মৈত্রেয়ী সভ্যতার মর্মবাণী। সভ্যতার এই দুটি দিকের অপূর্ব এক আলোকিত সমন্বয় ঘটিয়েই প্রাচীন ভারতবর্ষ একদা জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন অর্জন করেছিল। কিন্তু পরবর্তী-

কালে জীবনের নিয়মেই অবক্ষয়ের অন্ধকার গ্রাস করল আমাদের ; বিশেষ করে বৌদ্ধযুগের শেষেই ভ্রষ্ট হলাম আমরা এই সমন্বয় থেকে। বহিঃ-প্রকৃতি জয়ের সব প্রযোজনা থেকে সরে গিয়ে অন্তঃপ্রকৃতি জয়ের দিকেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করল জাতি। কাষায় বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে গেল সমগ্র ভারতবর্ষ। নষ্ট হল জীবনের ভারসাম্য। ফলতঃ মহাজীবনের তপস্যা থেকেও ক্রমে ভ্রষ্ট হয়ে পড়লাম আমরা। তারপর দীর্ঘ সময়—যুগ যুগ ধরে অবিরাম তমসাচ্ছন্ন মৃতপ্রায় ভারতবর্ষের অসহায় ইতিবৃত্ত। জাতি হিসেবে আমরা হারিয়ে গেলাম জীবনের পাদপ্রদীপ থেকে। ভেড়ার পালে সিংহ-শাবকের মতোই আত্মভ্রষ্ট স্বধর্মচ্যুত হলাম আমরা। সেই যুগ-যুগ-সঞ্চিত অন্ধকারের অতল থেকে স্বামীজী গোটা জাতিকে টেনে তুলে আনলেন প্রাণদৃপ্ত চলিষ্ণু মহাজীবনের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে। সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির এক মানবিক প্রত্যয়ে তিনি প্রতিষ্ঠাপিত করতে চাইলেন জাতিকে। ব্রতী হলেন সর্ববন্ধনমুক্ত পরিপূর্ণ মানবতার অভিসন্ধানে ভারতের জন্য এবং বিশ্বের জন্যও।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নামহীন গোত্রহীন এক অখ্যাত সন্ন্যাসীর প্রদত্ত কয়েকটি মাত্র বক্তৃতা! তা যেন প্রাণে প্রাণে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে দিয়ে গেল মৃতপ্রায় জাতির শিরায় উপশিরায়, শুষ্ক ক্ষীণ তার ধমনীতে ধমনীতে। অবাক সেই আশ্চর্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ আজো সমানভাবে ক্রিয়াশীল। সেই প্রথম আমরা জানতে পারলাম আমরা মরি নি। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকায় তাই যথার্থই লেখা হয়েছিল যে এ যাবৎ আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা যা করতে পারেন নি, সেই অসাধ্য সাধন করে এলেন ত্রিশ বছরের যুবক বেকার নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিশ্বের মানচিত্রে ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্য এক মহৎ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন। মহান দেশ ভারতবর্ষের মঙ্গল-সুসমাচারের কথা সেই প্রথম বিশ্বপৃথিবী জানতে পারল। সম্রাজ্ঞীর স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন দেশমাতৃকা—আমাদের এই ভারতবর্ষ। "ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ। কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল? / দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল। / অনন্তের তুমি অধিকারী প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান।" বললেন, "যখন মানুষ নিজেকে ঘৃণা করিতে

আরম্ভ করে, তখন বুঝিতে হইবে তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে। ......অতএব তোমরা আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন হও, তোমাদের পূর্বপুরুষের নামে লজ্জিত না হইয়া তাহাদের নামে গৌরব অনুভব কর; আর অনুকরণ করিও না, অনুকরণ করিও না।" কিংবা সেই আগ্নেয় বাণী :

"Never forget the glory of human nature. We are the greatest god that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless Ocean which I am."

আমরা শুধু হাত পেতে ভিক্ষা নেব না। আমরাও কিছু দেব। "দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে"-র পথে আমাদের জাতীয় জীবনের সেই প্রথম পদযাত্রা; —পূর্বের প্রাঙ্গণের অভিমুখে সেই আমাদের প্রথম অভীক উত্তরণ। যদিচ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হিসেবে সর্বত্র সকল মানুষকে বৃহতের অভিমুখে সমুত্তীর্ণ করে দেয়াই ছিল স্বামীজীর জীবন সাধনা এবং তিনি নিজেই একথা উচ্চারণ করে গেছেন: "I shall not cease to work! I shall inspire men everywhere, until the world shall know that it is one with God—"—তথাপি সকলের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির অক্লান্ত রূপকার স্বামী বিবেকানন্দ মানবজীবন ও সমাজের সবরকম সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের কথা চিন্তা করে গেছেন। সকলের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর সুস্থ সার্বিক জীবনরচনার সামগ্রিক সংকল্পে নিত্য নিষ্ঠ ছিলেন তিনি। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি—এক কথায় মানুষের জীবন ও তার সমাজসম্পর্কিত এমন কোনো জিজ্ঞাসা নেই যা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় স্থান পায়নি। একই সঙ্গে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ এবং বিশ্বপৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য আগামী দেড়/দুই হাজার বছরের জন্য একটি পূর্ণায়ত পরিকল্পনা রচনা করে গিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীও এই কথাই বলেছেন 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে: "জীবনের এমন কোনো সমস্যা নেই, এমন কোনো দিক নেই, যে বিষয়ে এবং যে দিকে স্বামীজী চিন্তা করেননি এবং নতুন আলোকসম্পাত করেননি। তাঁর সঙ্গে সব বিষয়ে আমরা একমত না হতে পারি, কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে তাঁর প্রত্যেক চিন্তা গভীর ও মৌলিক এবং তার মধ্যে তাঁর সর্বজন-

বিদিত মানব প্রেমের স্পর্শও সুস্পষ্ট।" জাতি-ধর্ম ভাষা ও নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ যাতে এই পৃথিবীকে তাদের এবং তাদের নবজাতকের বসবাস-যোগ্য মনে করতে পারে তার ব্যবস্থা করে গেছেন স্বামীজী। তাঁর গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দের কাছে যথার্থই তিনি বলেছেন : "যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকত তবে বুঝতে পারত বিবেকানন্দ কী করে গেল।" একই সঙ্গে দেশ ও জাতির এবং বিশ্বপৃথিবীর মানুষের সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্য স্বামীজীর এই আজীবন নিরলস কর্মপ্রয়াসকে—ভগিনী নিবেদিতা দুভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রথম হল জাতি সংগঠন (Nation Building) এবং দ্বিতীয় বিশ্বজাগরণ (World Awakening)।

সর্বাত্মক এই জাতি-সংগঠনের প্রয়োজনে সামগ্রিকভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর নবজীবন রচনার দায়ভাগ গ্রহণ করেছিলেন বলেই জীবনের সব দিকে তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। মানবমনের সকল রকম আত্মপ্রকাশ যাতে সহজ ও স্বাভাবিক হয়, বৃহত্তর জীবনের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়—এই কারণেই ভারত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমস্ত বিভাগের সমুন্নতির প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে ভাবতে হয়েছিল। শুধু সমাজনীতি অর্থনীতি নয়, ক্রম অবক্ষয়ে ক্ষীণ, অবসন্ন, আত্মভ্রষ্ট, একদা সুসভ্য এই প্রাচীন জাতির শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল চারুশিল্প—এবং সর্ব বিষয়েই যাতে সম্যক অগ্রগতি ঘটে তারই জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন স্বামীজী।

স্বামীজী বিশ্বাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগ এসে গেছে। এবং সত্যযুগ মানেই হল সার্বিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—সর্বাত্মক উৎকর্ষ বা প্রগতির প্রতিশ্রুতি : ফুলে ফসলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও তার সমাজ। তাই স্বামীজীর স্থির বিশ্বাস ছিল, "জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।" তিনি এও বলেছিলেন : আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। ...ঠাকুর নিজে একজন কতবড় artist ছিলেন। প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতাও গুরুর প্রসঙ্গে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন : 'সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান—যে কোনো তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি যে সেই চরম অনুভূতিরই একটি দৃষ্টান্তমাত্র, তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া

দিতেন। তাঁহার চক্ষে কোনো জিনিসই ধর্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল না।" তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সমন্বয়ী মানবধর্মের মূল লক্ষ্যই হল একই সঙ্গে মানুষের ঐহিক ও পরমার্থিক সকল প্রকার সমুন্নতি ও পূর্ণতার পথে নিরন্ত অভিসার। কারণ, প্রভু আমাদের নিত্যেও আছেন, লীলায়ও আছেন। তাই নিত্য লীলা দুইই তিনি গ্রহণ করেন। নিবেদিতা তাই যথার্থই বললেন : "কেবল তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনভূমি হন নি, অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনক্ষেত্রও হয়েছেন। যদি এক ও বহু সমসত্য হয় তাহলে কেবল বিভিন্ন ধর্মই নয়, বিভিন্ন কার্যরীতি, সংগ্রামরীতি সৃষ্টিরীতি সকলই উপলব্ধির নানা পথস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আর আধ্যাত্মিক ও ঐহিকের মধ্যে পার্থক্য করা চলে না। অতঃপর শ্রমে ও সাধনায় ভেদ নেই, জয়ে ও ত্যাগে ভেদ নেই। জীবনই ধর্ম। অর্জন ও ধারণ—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই জীবনের কঠিন দায়িত্ব।" সকলের এই কঠিন দায়িত্ব পালনের দায়ভাগ, শুধু ভারতবাসীর উপরেই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের হাতে অর্পণ করা এই হল ঠাকুর-স্বামীজী-প্রবর্তিত নব ধর্মের একমাত্র মঙ্গল সুসমাচার : ধর্মই জীবন এবং জীবনই ধর্ম। জীবনকে ধর্মে উন্নীত করা আর ধর্মকে জীবনের সর্বত্র ধরে রাখা। এই জীবন ও ধর্মের সমন্বিত ঐকতানই ভারতবাসীকে স্বামীজী নতুন করে নতুন সুরে শোনালেন। এই কারণেই দেখি শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চারুকলা-চিত্রবিদ্যা-ভাস্কর্য-স্থাপত্য-গৃহসজ্জাবিদ্যা—সব প্রসঙ্গেই স্বামীজীর অপার উৎসাহ, অনন্ত উদ্দীপনা, অসীম কর্মতৎপরতা। শিল্পে-সঙ্গীতে-সাহিত্যে-চারুকলায়—এমন কি খেলাধূলায় পর্যন্ত ভারতবর্ষ জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক বিশ্বের দরবারে—স্বামীজীর এই ছিল একান্ত অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। কারণ এ সবই যে মানুষের সর্বাত্মকভাবে হয়ে ওঠার সাধনার অন্তর্গত। আর সমগ্র জাতির এভাবে সর্বাত্মক হয়ে ওঠার (becoming) ঐ এক সাধনাই তো নব-জাগরণেরও একক অম্বিষ্ট। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ও প্রগতি আসবে, মানবাত্মার সকল প্রকার আত্মপ্রকাশের শাখা-প্রশাখা ফুল্লকুসুমিত হয়ে উঠবে, পরিণামে পরিপক্ক ফলভারে আনতে হবে। নবজাগরণেরও তো এই হল স্বরূপ লক্ষণ। তাই ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চারুকলা-ভাস্কর্য-স্থাপত্য-চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সভ্যতার সকল অঙ্গেরই পরিপুষ্টি ও

বিকাশ—আমাদের নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ রূপকার স্বামীজীরও পরম প্রার্থিত। সাহিত্য-শিল্প, বিশেষ করে সঙ্গীত ও চারুকলা যে মানুষের আত্মপ্রকাশের বাহন শুধু নয়, আত্মোপলব্ধিরও পথ এবং এই সবের মধ্য দিয়েই যে মানুষের চিত্ত-চেতনার আত্মিক উৎকর্ষ লাভ ঘটে—স্বামীজী এই জীবন-সত্যেও বিশ্বাসী ছিলেন। তাই জীবনের এই বিশেষ দিনগুলির প্রতি স্বামীজীর ছিল নিত্য-কোজাগর দৃষ্টি এবং আজীবন সাধনা। তাছাড়া তিনি এ-ও জানতেন যে চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যকে প্রকাশ করার তিনটি উপায়। তাই এই তিন বিষয়েই—তিনি নিজেই যে শুধু অভিজ্ঞ পারঙ্গম ছিলেন তাই নয়, সমগ্র জাতি যাতে এই তিন বিষয়েই সমান উৎকর্ষ লাভ করতে পারে—তার জন্য আজীবন প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

৮

ভারতের সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি চারুকলায় স্বামীজীর অবদান

অনেকেই হয়তো জানেন না—গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই স্বামীজীও চারুকলার বিভিন্ন বিভাগে—সঙ্গীতে ও নৃত্যে সমান পারদর্শী ছিলেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আচার্য নন্দলাল বসুর উক্তি এখানে স্মরণীয়: "ঠাকুর নিজে একজন শিল্পী ছিলেন। ছবি ও মূর্তি তৈয়ারী করতেন। শুধু idealist নন, রসিক শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আঙ্গিকের বিষয়ও বেশ জানতেন। আর ছবি বা মূর্তি দেখে ভাব ও গড়ন (form) ভুল হলে তা ঠিক করে দিতে পারতেন।...দক্ষিণেশ্বরের পাথরের গোবিন্দজীর পা ভেঙে গেলে তা তিনি অতি নিপুণতার সহিত জুড়ে দিয়েছিলেন।... দুর্গাপ্রতিমা গড়ার সময় পোটোদের সব সময় guide করতেন। তিনি প্রতিমার উপরের চালচিত্র আঁকার ভারও কখনো কখনো নিতেন। প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তাঁর ডাক পড়ত, চোখের তারা ঠিক জায়গায় দেওয়া বড় কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে সংশোধন করে দিতেন। তিনি একজন সহজ শিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন।" ঠাকুরের

সঙ্গীত-প্রতিভাও ছিল অনন্যসাধারণ। গলার স্বরটি ছিল ভারী মিষ্টি ও সুরেলা। এই গুরুরই উপযুক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। শুধু সহজাত প্রতিভা নয়, স্বামীজী ছোটবেলা থেকে ওস্তাদের কাছে হিন্দী, উর্দু, পারসী এবং উচ্চাঙ্গ মার্গ সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। বিবিধরকম যন্ত্রসঙ্গীতেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। দত্তবাড়ীর পারিবারিক থিয়েটারে মঞ্চ-উপস্থাপনা, দৃশ্যসজ্জা প্রস্তুতির অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন তিনি কৈশোর থেকে। এবং দেশী-বিদেশী সঙ্গীতের তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ সমঝদার। মাত্র ২০ বছর বয়সে "সঙ্গীত কল্পতরু"র সম্পাদনা এবং তার ভূমিকা রচনা স্বামীজীর উজ্জ্বল সঙ্গীত-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রসঙ্গতঃ ব্রাহ্ম-সমাজে সঙ্গীত পরিচালনার কথাও আমাদের মনে পড়ে। হিন্দী বাংলা ইংরেজীতে তিনি গানও রচনা করে গেছেন এবং বহু সঙ্গীতের সুর দিয়ে স্বরলিপি তৈরী করেছেন।—

যথার্থ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞা-পরিশীলিত শুদ্ধ স্বদেশানুরাগ ও দেশ-প্রেমের প্রসার এবং আত্মার ঊর্ধ্বায়না সম্ভব—এ সতো তিনি আস্থাবান ছিলেন। এই কারণেই ভারতীয় সঙ্গীতের অবক্ষয় তাঁকে পীড়া দিত। ভারতীয় সঙ্গীতের তৎকালীন অতিরিক্ত অলঙ্কারপ্রিয়তা ও বহিরঙ্গ ঠাট-ঠমক স্বামীজী পছন্দ করতেন না। বিশ্বসংস্কৃতিতে ভারতীয় সঙ্গীতের অনবদ্য অবদানের কথা স্মরণ করে স্বামীজী গৌরবান্বিত বোধ করতেন। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক সঙ্গীত প্রভৃতি ধারার কথাও স্বামীজী চিন্তা করেছেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কেও স্বামীজীর ছিল অসাধারণ জ্ঞান। ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিশ্রণের সম্ভাবনাও তাঁর কল্পনায় ছিল। কিন্তু শিল্পে সঙ্গীতে চারুকলায় ভারত তার নিজস্ব ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে পরানুকরণের মোহে স্বধর্মভ্রষ্ট হোক—স্বামীজী তা সহ্য করতে পারতেন না। কারণ শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের সঙ্গে যদি দেশের মাটির যোগ না থাকে—তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এবং সে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত জীবন রচনার কোনো কাজে লাগে না। তাই এ ব্যাপারে আমাদের এত সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। ভারত-সঙ্গীতের আত্মা লুকিয়ে আছে ধ্রুপদ-এ। কীর্তন বাংলার নিজস্ব সম্পদ হলেও তার করুণ রসের আধিক্যের জন্য তিনি কিছুদিনের জন্য কীর্তন বন্ধ করে জাতিকে গভীর ভাবোদ্দীপক ধ্রুপদকে

গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। বীররসের কর্ষণাই এখন জাতির পক্ষে সবচেয়ে মঙ্গলকর। ভারতীয় সঙ্গীতে হারমনির অভাবের জন্য বীররসের স্বল্পতা স্বামীজীকে উত্তেজিত করত, যদিচ আমাদের মার্গ সঙ্গীতের অন্যান্য বিশিষ্ট গুণাবলী স্মরণ করে (Cadence বা মিড মূর্ছনা গমক প্রভৃতি) সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনায় ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে গেছেন। সব মিলিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের ব্যাপ্তি ও সাবভৌম রসাবেদনের কোনো তুলনা নেই। এবং অতি বিজ্ঞানসম্মত এর সুর-সরগম ও সূক্ষ্মতম স্বরবিভাজনপদ্ধতি বিশ্বের বিস্ময়।

আমাদের শিল্পে-সাহিত্যে-সঙ্গীতে সর্বাত্মক অবক্ষয় দেখে স্বামীজীর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: "যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু'একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।...ওটি শুধু ভাষায় নয়, সব শিল্পতেই এল।...এখন ক্রমে বুঝবে যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনো কাজের নয়।" আবার বললেন, "আমাদের দেশে স্বাধীন চিন্তার স্রোত যে প্রকারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়।" আরো বললেন: "গানের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতের হৃদয়োন্মাদী ভাব। আগে একটি সুর স্বতন্ত্রভাবে নিজের বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হত অথচ একই সঙ্গে অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করত—এখন কিন্তু সুরগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর বজায় রইল না। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীত নানাবিধ সুরের জগাখিচুড়ির মতো—মিশ্র সুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টিমাত্র। সঙ্গীতের এই হল অধঃপতন।" আরো বলছেন: "গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম। সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল ছত্রিশ নাড়ির টান তায়রে বাপ। তার উপরে মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব।"—স্বামীজী সবসময়ই মৌলিকতার সন্ধান করতেন। তাই নতুনকে স্বাগত জানাতে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। কারণ তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস ছিল নিজের সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের উপর। তাই বাংলা

ভাষায় নতুন রাগরাগিণীর সৃষ্টি সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। বাংলায় খেয়াল ধ্রুপদ রচনা করতে তিনি সকলকে উৎসাহ দিতেন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সঙ্গীতে শিল্পে চারুকলায়ও স্বামীজীর ছিল "চরৈবেতি"-র সাধনা। শিল্পে সঙ্গীতে চারুকলায়ও স্বামীজী চিরকাল প্রাণশক্তির বন্দনা করে গেছেন। প্রাণশক্তি যার আছে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও একদিন তার মুক্তি সম্ভব। ভারত-শিল্পে সেই প্রাণশক্তির অভাবই স্বামীজী মর্মবেদনার কারণ! শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতেও তিনি পৌরুষ ও বলিষ্ঠতার সন্ধানী ছিলেন। ভারত শিল্পে ঐ পৌরুষের আবাহন করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। আধুনিক ভারতীয় সঙ্গীতে ও চারুকলায় মৌলিকতার চেয়ে—প্রাণশক্তিহীন অলঙ্কার-বাহুল্য দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। কিন্তু স্বামীজীর সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রাণশক্তি বা পৌরুষ আজো কি আমাদের শিল্পে সাহিত্যে সঙ্গীতে চারুকলায় আমরা আনতে পেরেছি? সঙ্গীত প্রসঙ্গে তাঁর যে পূর্বোক্ত বর্ণনা তা কি আমাদের সমকালীন শিল্প-সঙ্গীত প্রসঙ্গেও সমভাবে প্রযোজ্য নয়? অথচ বাঁচতে হলে এ গোলকধাঁধার অন্ধ আবর্ত থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতেই হবে। আবাহন করতে হবে বলিষ্ঠ পৌরুষ ও দৃপ্ত মানবিকতা আমাদের চারুকলার অঙ্গনে। অন্যথা ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এবং এখানেই, বলা বাহুল্য, আজো স্বামীজীর সমান প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান।

চিত্রাঙ্কনে চারুশিল্পেও স্বামীজী একটি সুউচ্চ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন জাতির চোখের সম্মুখে এবং ভবিষ্যতের পথনির্দেশ রেখে গেছেন। চিত্রাঙ্কন-ভাস্কর্য-স্থাপত্য প্রভৃতি এবং অন্যান্য কারুশিল্প ও চারুকলা প্রসঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাভাবনা ও মতামত ছিল একান্তভাবে গভীর, ব্যাপক ও সর্বগ্রাহী এবং মৌলিকতার দীপ্তিতে ভাস্বর। তাই তৎকালীন বাংলাদেশের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হয়ে বলেছেন: "বিশেষ দুর্দশা হয়েছে বাংলাদেশের শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোরে আল্পনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র ক'রত। বাহার ক'রে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তাবলে কি পুরানোগুলোকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি!! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনো দূর পাড়াগাঁয়ের পুরানো কাঠের কাজ, ইটের কাজ দেখে এসোগে।

কলকেতার ছুতোর একজোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না। দোর কি আগড় বোঝবার উপায় নেই!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতী যন্ত্র কেনা!!!" যদিচ বিবেকানন্দের সমগ্র নন্দনতত্ত্ব-চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গি শেষপর্যন্ত—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—অধ্যাত্মচিন্তায় বিধৃত হয়ে আছে, তথাপি চারুশিল্পের নানাদিক, উপস্থাপনার নানা রীতি নীতি ও আদর্শ নিয়ে এবং শিল্পান্দোলনের গতি-প্রকৃতি প্রসঙ্গে যথার্থ একজন বিশেষজ্ঞের মতো আলোচনা ও মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। এছাড়াও শিল্প-জিজ্ঞাসার নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও অনেক কথা বলে গেছেন স্বামীজী—যা আজো সমানভাবে গ্রাহ্য এবং আমাদের শিল্পে প্রগতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আজকাল চারিদিকে যে লোকশিল্পের চর্চা ও গবেষণা চলেছে, ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে—তার পশ্চাতেও স্বামীজী। কালিঘাটের পটে, গ্রাম্য ছেঁড়া কাঁথায়, আলপনায়, পূজাপার্বণের চিত্রাবলীতে যে এত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, এত শিল্প—তাও তিনিও প্রথম আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। জয়পুরে সোনালী চিত্রি, দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি, রাজস্থানের বিশেষ ধরনের ছবি, পুরানো কাজকরা ধাতুর পাত্রাদি, গ্রাম্য চাষী ও উপজাতীয় মেয়েদের মধ্যে ব্যবহৃত ভারী মোটা অলঙ্কার—এসবেব যথার্থ মুল্যায়ন করে প্রথম শিল্পের মর্যাদা দান করেন স্বামীজী। লোক-শিল্পের ব্যাপক গভীর নান্দনিক, দার্শনিক, সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রতীকী ভূমিকা সম্পর্কেও স্বামীজী প্রথম আমাদের অবহিত করে গেছেন। এবং জাতীয় শিল্পের ভাবময় ঐতিহ্য ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে—অর্থাৎ স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে—তিনি নতুনকেও সমভাবে স্বাগত জানাতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। অধ্যাপক অমলেন্দু বসু মহাশয় যথার্থই মন্তব্য করেছেন এ সম্পর্কে: "নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দার্শনিক ও সামাজিক ভূমিকাটিই স্বামীজীর চোখে বড়; প্রয়োজনের তাগিদে শিল্পের স্থূলতা তিনি পছন্দ করেন নি। শিল্প ও প্রচার এক কথা নয়। শিল্প-সাহিত্য মানুষকে বড় হওয়ার তাগিদ দেবে, তাকে মহান করে তুলবে, কিন্তু নান্দনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীকে অস্বীকার করে নয়।"—যদিচ তিনি উপযোগ বা প্রয়োজন এবং সৌন্দর্যকে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দেবার পরামর্শও দিয়েছেন। এবং রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের সমন্বয়ের কথাও তিনি বলে গেছেন।

কৈশোরে যৌবনে স্বামীজী নিজের হাতে শিল্প রচনা করেছেন।

পরবর্তীকালেও স্বামীজীর পোর্ট্রেট আঁকার ঝোঁক আসে এবং তা চরিতার্থ হয়। শ্রীমতী মড স্টামের কাছেও চিত্র-শিল্পের পাঠ গ্রহণ করেন তিনি এক সময়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পকলা-চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি তিনি বার বার দেখেছেন, বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন তাদের শিল্পশৈলীর ও রূপরীতির। স্বদেশের চারুশিল্পের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ সম্পর্কেও তাঁর ছিল পরিপূর্ণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাই সব মিলিয়ে দেখা যায় স্বামীজী ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্প সমালোচকও। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব ছিল না। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত "ব্রহ্মবাদিন্"—পত্রিকার প্রথম প্রচ্ছদপটের নির্মম সমালোচনা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকচিহ্নের পরিকল্পনা ও রচনায় তাঁর 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা' প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় প্রতীকী ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে সম্যক জ্ঞান ছিল স্বামীজীর—তারও সার্থক নিদর্শন ও সাক্ষী ঐ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকচিহ্নটি। ছন্দোময় ও অপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের পরিকল্পনা—স্বামীজীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করছে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে শিল্পের ক্ষেত্রেও আমাদের পরানুবাদ, পরানুকরণ ও পরমুখাপেক্ষার নির্মম সমালোচনা করে ধিক্কার দিয়েগেছেন স্বামীজী। শিল্প সম্পর্কে নিজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এবং ভারতীয় শিল্পের মৌলিক আদর্শের প্রতি একান্ত আনুগত্যের ফলে—তৎকালীন ভারতবর্ষের বহুশ্রুত দেশপ্রসিদ্ধ শিল্পী রবি বর্মার সমালোচনা করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকা তাঁর ঐ সব রামায়ণ-মহাভারতের ও অন্যান্য ছবি তরুণ শিল্পীদের বিভ্রান্ত করবে, পথভ্রষ্ট করবে এই আশঙ্কায় তিনি সেদিন অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন: "ওদের (ইউরোপীয়দের) নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ্ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।" সেদিন অখ্যাত এক সন্ন্যাসীর মুখে ভারতবিখ্যাত শিল্পীর এই কঠোর সমালোচনা—অনেকের কাছে ধৃষ্টতা মনে হলেও পরবর্তীকালে স্বামীজীর মত-ই সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছিল এবং বিশেষজ্ঞদের সমর্থন লাভ করেছিল।

আমাদের ঐ অক্ষম নকলনবিসি প্রসঙ্গেই স্বামীজী বলেছিলেন, "দেশশুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ্, আর পরের রাঙ্টাকে সোনা দেখছে।" আবার অন্যত্র বলছেন:—"তারপর যখন জাতীয় প্রাণশক্তি অবলুপ্ত হল… তখন থেকেই অবনতির সর্বশেষ লক্ষণ দেখা গেল।…শুধু "ওটি ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে, ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নার লতা-পাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধূম!! ইত্যাদি।" বিশাল ব্যাপ্ত অথচ গভীর ও সূক্ষ্মতম ভাবরাশির প্রকাশের জন্যই শিল্প, চারুকলা। শিল্পে যদি সেই ভাবেরই অভাব হয়, তাহলে আর সেখানে কী অবশিষ্ট থাকে? ভাবহীন প্রাণহীন অকারণ অতি-অলঙ্করণ প্রসঙ্গে স্বামীজী—"হীরে-মোতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর" বসানোর উপমা প্রয়োগ করে এর বিসদৃশ অসঙ্গতি, নৈরাজ্য ও বীভৎসতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমাদের চিত্রশিল্প-ভাস্কর্য-স্থাপত্য-সাহিত্য —সর্বত্র এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ছিল বিপ্লবী বিবেকানন্দের আজীবন সংগ্রাম।

যে এশিয়াবাসীদের জীবনে—প্রতি পদক্ষেপে ছিল আর্ট-এর স্বচ্ছন্দ সুন্দর প্রকাশ, তাদের জীবন থেকে শিল্পের ক্রমনির্বাসন দেখে স্বামীজীর ক্ষোভের শেষ ছিল না। অতঃপর এশিয়া ও ইওরোপের শিল্পদৃষ্টি ও শিল্প-চেতনা-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: "ঐ আর্টের জন্যই ওরা (জাপানীরা) এত বড়। তারা যে Asiatic। আমাদের দেখছিস না সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা।" "প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না।" আর পাশ্চাত্যের. বিশেষ করে ইংরেজদের প্রসঙ্গে বলছেন: "সাহেবদের ইউটিলিটি আর আমাদের আর্ট।" কিন্তু "এখন (অর্থাৎ এ যুগে) চাই আর্ট আর ইউটিলিটির সংযোগ, যেটা জাপান চট্ করে করতে পেরেছে, এবং সেজন্যই দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে।"—আবার শিল্পে ভাবের প্রকাশ সবচেয়ে আগে, একথাও স্বামীজী বার বার বলেছেন। তাই একদিকে প্রাণহীন ভাবহীন অকারণ অলঙ্কারবাহুল্য, আবার অন্যদিকে আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার নামে অতীন্দ্রিয় পরিস্ফুটনের অতিমাত্রিক ব্যগ্রতায় ও প্রাবল্যে কিম্ভূতকিমাকার বিকট আকৃতির মূর্তিরচনা দুইয়েরই স্বামীজী কঠোর সমালোচনা করেছেন।

ভারতীয় শিল্পের অবক্ষয় প্রসঙ্গে বললেন: "শিল্পের মধ্যে আর সেই ভাবের বিশিষ্টতা, কল্পনার উদারতা রইল না, রচনা শৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দও হারিয়ে গেল ;—তার বদলে নিদারুণ আলঙ্কারিক বর্ণবহুল এক রীতির উদ্ভব হল। জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্ধান করল।" সতর্ক পাঠক চিন্তা করে দেখুন, এসব নির্মম বিশ্লেষণ আজকের সমকালীন শিল্প-চারুকলা সম্পর্কেও কি সমান সত্য নয়—?—স্বামীজীর পথ-নির্দেশের তাই আজো সমান প্রয়োজন এবং এখানেই স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা।

দেশের তৎকালীন বিভিন্ন চারুকলা বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে অনুসৃত ভ্রান্ত আদর্শের অনুকরণ দেখে—তীব্র সমালোচনা করে আমাদের সত্য-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন স্বামীজী। সেই যুগে ভারত-বিখ্যাত চিত্রকর রবি বর্মাকে সমালোচনা করার সাহস হয়েছিল তাঁর, কারণ তিনি ভারতীয় শিল্পধারাকে ভ্রান্ত আদর্শ ও পথ থেকে ফিরিয়ে এনে তার নিজস্ব পথে প্রবাহিত করে দিতে চেয়েছিলেন। তখনকার আর একটি ব্যাপারেও তিনি পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন চারুকলা-বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ইওরোপের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দেশ, স্বামীজীর ভাষায় যারা শুধু তৃতীয় শ্রেণীর ল্যাণ্ডস্কেপ এবং পোর্ট্রেট এঁকেই গেল, সেই ইংরেজদেরও প্রাদেশিক শিল্পের চল্লিশ বছরের পুরোনো জঘন্য ঐতিহ্যরীতির অক্ষম অনুকরণের ধূম লেগেছিল। এর ভয়াবহ সর্বনাশা পরিণামের কথা চিন্তা করে—এই ভ্রান্ত পন্থা ও আদর্শের অনুসরণ থেকে জাতিকে নিবৃত্ত করতে তিনি উদ্যোগী হলেন এবং কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। শুধু পরামর্শ, বিতর্ক-আলোচনা বা উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। বস্তুতঃ স্বামীজী একটি বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হলেন। দেশের সংস্কৃতিনিষ্ঠ শিক্ষিত রুচিবান শিল্পরসিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন তাঁর নিজস্ব অভিমত। প্রিয় শিষ্যা নিবেদিতা—যাঁকে তিনি হাতে ধরে ভারতীয় শিল্পাদর্শে দীক্ষা দিয়ে—বৃহত্তর ভারতের শিল্পজগতের সঙ্গে, ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁকে তিনি প্রধান সহযোগী করলেন এই ব্যাপারে। এবং নিবেদিতার মাধ্যমেই সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ই. বি. হ্যাভেল সাহেব, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পরীতি সম্পর্কে অবহিত, প্রভাবিত এবং উৎসাহিত

হলেন। শিল্প যে জাতীয় সৌন্দর্যবোধের সহজ স্বাভাবিক অভিব্যক্তি—এবং পরাধীন জাতির জনগণকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে এর প্রভাব ও অবদান যে অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী—স্বামীজী-বিঘোষিত এই জীবনসত্য শেষ পর্যন্ত ভারতশিল্পপ্রেমী আচার্য হ্যাভেল সাহেব মেনে নিলেন এবং সরকারী আনুকূল্যে বিদ্যালয়গুলিতে প্রাচ্য ও ভারতীয় শিল্পরীতি-পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটল। এবং এভাবে পরোক্ষে হলেও স্বামীজীই ভারতীয় শিল্প আন্দোলনকে আত্মমর্যাদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন।* এবং এ পথেই পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির চরম উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতম রূপকার-প্রতিনিধি হয়ে এলেন আচার্য নন্দলাল বসু। এবং ভারত-শিল্পের অমৃত-অভিস্নানে পবিত্র চরিতার্থ হয়ে স্বামীজী-প্রবর্তিত পথে অনুবর্তন করলেন নিবেদিতা স্বয়ং, প্রখ্যাত জাপানী শিল্পী ওকাকুরা, আনন্দ কুমারস্বামী, শ্রীঅরবিন্দ, উড্রফ্ প্রভৃতি মনীষী-বৃন্দ। চারুশিল্পের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অজস্র আলোচনার সন্ধান পাওয়া গেছে স্বামীজীর রচনাবলীতে, তাঁর বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে। তার আনুপূর্বিক আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। কিন্তু ভারতশিল্পের আন্দোলন ও ইতিবৃত্তে স্বামীজীর আর একটি অক্ষয় কীর্তির উল্লেখ না করে পারছি না এখানে। সেটি হল ভারতশিল্পের উপরে তথাকথিত গ্রীক-প্রভাব প্রসঙ্গ এবং স্বামীজীর মহান ভূমিকা। স্বৈরাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শাসনের নামে যে নির্মম ভারত-শোষণ ও পেষণক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছিল তার কৈফিয়ৎ হিসেবে তারা বিশ্বপৃথিবীর মানুষের কাছে এ যাবৎ বলে আসছিল যে, শ্বেত মানুষের দায় গ্রহণ করেই তারা ভারতে এসেছে—এবং অশিক্ষিত অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন অর্ধ-উলঙ্গ ভারতীয়দের সভ্য ভদ্র শিক্ষিত করবার জন্যই, এক কথায় মানুষ করবার প্রয়োজনেই, ওদের এই ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ। কিন্তু বিগত শতকের প্রথম থেকেই—দেশে বিদেশে, বিশেষ করে শ্যাম, কাম্বোডিয়া, বালী, সুমাত্রা, যবদ্বীপ—প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পসমৃদ্ধ বহু ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের বিদগ্ধ জনের দৃষ্টি পড়ল ভারতের উপর এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন শুরু হয়ে গেল দেশে দেশে। অতীতে যে জাতি,

* ডঃ কালিদাস নাগ তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন: বিবেকানন্দ-নিবেদিতার যুগকে অস্বীকার করে কোনো শিল্প-ইতিহাস দাঁড়াতে পারে না।

যে দেশ এরকম আশ্চর্য শিল্পকর্মের, ভাস্কর্যের ও স্থাপত্যের মহিমময় দিব্য রূপসকল সৃষ্টি করেছে, তাদের অসভ্য বর্বর বলে মেনে নিতে সকলে রাজী হলেন না। মুশ্‌কিলে পড়লেন আমাদের ব্রিটিশ প্রভুরা। এবং অচিরেই মুশ্‌কিল আসানের পথ বের করে ফেললেন। ইওরোপের অন্যান্য সমগোত্রীয় পররাজ্যলোলুপ লুণ্ঠনব্যবসায়ী অত্যাচারীদের সঙ্গে যুক্তি বুদ্ধি করে রাতারাতি একটি নতুন তত্ত্বের (theory) উদ্ভাবন করলেন তাঁরা। ঐ দু'পাঁচটা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন এখানে ওখানে দেখা গেলেও—ওসবের পশ্চাতে ভারতের কোনো মৌল অবদান নেই। গান্ধার শিল্পের কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপিত করে তাঁরা আরো ঘোষণা করলেন—ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি সবই গ্রীক সহায়তার ফল—এবং ভারতের যাবতীয় বিদ্যা সুসভ্য গ্রীকদের বিদ্যার ছায়ামাত্র। ভারত-সভ্যতা বলে যা কিছু প্রচারিত সবই সম্ভব হয়েছে গ্রীকদের সংস্পর্শে এসে, তাঁদের সাহচর্যে। একমাত্র মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই মিথ্যা অপপ্রচার, এই ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার জবাব দিতে আর কেউ সেদিন এগিয়ে আসেন নি। অসম্মানজনক ওদের এই বিচিত্র স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ খণ্ডনের জন্য বিশাল এই ভারতবর্ষের কোনো শিল্পী-সাহিত্যিক-প্রত্নতত্ত্ববিদের কণ্ঠ একটি বারের জন্যও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেনি। রসনায় সত্যবাক্য ঝল্‌সে উঠতে দেখিনি একজনেরও। এবং শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিবাদের কণ্ঠও বিশ্বের দরবারে পৌঁছতে পারেনি। এই নিদারুণ অসত্যের বিরুদ্ধে যাঁর কণ্ঠ গর্জে উঠেছিল বিশ্বের বিদ্বজ্জনসভায় তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। ইওরোপীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও পীঠস্থান প্যারিসের ধর্মেতিহাসের প্রকাশ্য মহাসভায় বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত-মনীষীদের উপস্থিতিতে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে গ্রীক-প্রভাবের এই উদ্ভট বানানো মিথ্যা তত্ত্বটিকে—স্বামীজী তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ অথচ ওজস্বিনী ভাষায়, এবং যথোচিত তথ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপিত করে একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। এবং উক্ত কল্পিত তত্ত্বের নিরাকরণ করেই ক্ষান্ত হলেন না স্বামীজী ; ঐ মিথ্যা তত্ত্বের একেবারে উল্টো একটি তত্ত্ব ঘোষণা করলেন ঐ একই বিদ্বজ্জনসভায়। পুনর্বার যথোপযুক্ত তথ্যপ্রমাণাদি ও ক্ষুরধার যুক্তি-তর্কের সাহায্যে গ্রীক শিল্পে প্রাচ্য প্রভাবের কথা প্রতিষ্ঠিত করলেন

স্বামীজী এবং গ্রীক স্থাপত্য-ভাস্কর্যের তুলনায় ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করলেন। এবং এভাবে একজন নিঃসম্বল দরিদ্র সন্ন্যাসী শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষকে—মিথ্যা কলঙ্ক, চূড়ান্ত অবমাননা ও লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন। অথচ আজ আটত্রিশ বছর স্বাধীনতার পরেও ভারতবিদ্বেষী বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভারতের বিরুদ্ধে অবিরাম মিথ্যা কুৎসা রটনা—বিষোদ্গার, অন্যায়ভাবে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা আমরা খুঁজে পাই না—পাল্টা আক্রমণের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারি না। এই লজ্জাকর আত্মাবমাননা, এই ভীরুতা, কাপুরুষতা ও প্রতিমুহূর্তে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র মৃতসঞ্জীবনী রয়েছে স্বামীজীর রচনাবলী এবং তাঁর মহাজীবনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। আজ এই চূড়ান্ত দুঃখের দুর্দিনে স্বামীজীই হতে পারেন আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা এবং এখানেই স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করি আমরা, এবং বর্তমান সমাজের বিধ্বস্ত বিপন্ন ভূমিতলে দাঁড়িয়ে আমরা বার বার স্মরণ করি তাঁকে। অতঃপর শিল্পে-সাহিত্যে স্বামীজীর অবদান প্রসঙ্গে আচার্য নন্দলাল বসুর উক্তি উদ্ধৃত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করি: "বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির মতো চল্‌তি বলার ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় যেমন তৎকালীন সাহিত্য সাধারণের সহজবোধ্য ও জোরালো হয়েছিল, স্বামীজীও বাংলা ভাষাকে ঐ পথে চালিত করেছিলেন…। তিনি শিল্পে বহুদিনের জটিল mannerism-কে কঠোর ভাষায় আঘাত করেছেন। আগামী কালের শিল্প তাঁহার বাণী অনুসরণ করে সহজ, প্রাণবান ও দৃঢ় হবে।…শিল্পীদের কাছে স্বামীজীর ideal শিল্পের backbone-এর মতো!"

৯

বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য ও স্বামী বিবেকানন্দ

সঙ্গীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন চারুকলা প্রসঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত নিয়ে যে আলোচনা হল অতঃপর আমরা দেখব যে ঐ একই আদর্শ নিয়ে স্বামীজী সাহিত্যকর্মেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অর্থাৎ সাহিত্যের

মধ্যেও তিনি সেই একই বলিষ্ঠ পৌরুষ, নির্ভীক জীবনপ্রত্যয় ও উজ্জ্বল মানবিকতার অভিসঞ্চার ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী নিজেই বলতেন: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত,—এই অভয়বাণী শোনাতে আমার জন্ম। বস্তুতঃ সকল মানুষের সর্বাত্মক বন্ধনবিমোচনের ব্রতই তিনি পালন করে গেছেন তাঁর গদ্য-পদ্য-চিঠিপত্র-বক্তৃতাবলী প্রভৃতি সমগ্র সাহিত্য-কৃত্যের মধ্য দিয়ে। দুর্বলতা তাঁর কাছে বরাবরই পাপ। সাহিত্যেও এই ভীরুতা দুর্বলতাকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। শক্তি ছাড়া কোনো জাতি বা ব্যক্তি কারো জাগরণ বা মুক্তি সম্ভব নয়। সাহিত্যেও স্বামীজী এই শক্তির আরাধনা করে গেছেন। মাইকেল মধুসূদনের রচনা বাদ দিলে বাংলা ভাষায় বীররসের এমন সার্থক সম্প্রয়োগ বিবেকসাহিত্য ছাড়া আর কোথাও নেই।

এই বীররসের সাধনাই তিনি করে গেছেন তাঁর সাহিত্য-কর্মের মধ্য দিয়ে। ভীরুতা, ক্লীবতাই মানুষের সব অধঃপতনের কারণ। আর "অভীঃ"-ই হল একমাত্র জীবনজয়ের মহামন্ত্র। যে কারণে সঙ্গীতে ধ্রুপদী গান, বাঁশী নয়,—ঢাক-ঢোল-কাড়া-নাকাড়া জগঝম্পের প্রসার তিনি পছন্দ করতেন—, সেই একই কারণে সাহিত্য-কৃত্যের মধ্য দিয়েও বলিষ্ঠ পৌরুষ ও স্থির আত্মপ্রত্যয়ের বাণী ঘোষণা করে গেছেন। গোপীজনবল্লভ নয়নাভিরাম ব্রজের রাখাল নন, কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথি পাঞ্চজন্য-ধৃত হৃষীকেশেরই আজ আমাদের প্রয়োজন। এবং 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ'॥—এই হোক আমাদের সাধনমন্ত্র! সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি, সার্বিক জীবন সংগঠন এবং জাতীয় চেতনার ও মানসিকতার জাগরণও উর্ধ্বায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। ঐ আদর্শের প্রচারের জন্যই 'উদ্বোধন' সাহিত্য-পত্রের জন্ম। তাই যা কিছু জাতীয় চেতনার পরিপন্থী তার বিরুদ্ধেই তাঁর ধিক্কার এবং বিদ্রোহ। আমাদের হীনম্মন্যতা, ক্লীবতা দূর করে হৃদয়ে আবার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেবার মহৎ প্রয়োজনেই ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে স্বামীজী কলম ধরেছিলেন। সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে, তিনি মূলতঃ সাহিত্যিক ছিলেন না; নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে বিশ্বমানবের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি ও সার্বিক কল্যাণের প্রেরণাই তাঁর হাতে

কলম তুলে দিয়েছিল। এবং মানবাত্মার বন্ধনমুক্তির মতো শিল্প-সাহিত্যের বন্ধনমোচনও ছিল তাঁর মহান জীবন কৃত্যের অন্তর্গত।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির দুটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন (১) মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন এবং (২) সৌন্দর্য সৃষ্টি। স্বামীজী মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন—বিশেষ করে আমাদের এই ভুখণ্ডের মানুষের কল্যাণব্রত উদ্‌যাপনের প্রয়োজনেই কলম ধরেছিলেন। কিন্তু এই প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়েই নিজের অজ্ঞাতে এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে গেছেন—যা পেশাদার সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষেও একান্ত দুর্লভ। বিবেক-সাহিত্য মূলতঃ বক্তব্যপ্রধান হলেও, শুধুমাত্র বক্তব্যের গভীরতা ও ব্যাপ্তিতেই নয়, উপস্থাপনার সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যেও একক, অনন্যসাধারণ। জীবনে যে সামান্য পরিমাণ রচনা করেছেন: (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—১৯০২, বর্তমান ভারত—১৯০৫, পরিব্রাজক—১৯০৬, ভাববার কথা—১৯০৭, কয়েকটি গান এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় কিছু চিঠিপত্র, কাব্য-কবিতা এবং বক্তৃতাবলী) তার মধ্যে যে মহৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে—তার তুলনা নেই।

ভাষার দিক থেকেও স্বামীজীর বিপ্লবী পদক্ষেপ আমাদের মুগ্ধ করে। কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের আঙিনায় আবাহন করে এনেছেন তিনিই প্রথম। এবং কথ্য ভাষার এমন সার্থক সম্প্রয়োগ এর আগে পরে কোথাও দেখা যায়নি। ইতিহাসের পথ ধরে শূদ্র-রাজত্বের অনিবার্য আবির্ভাবকে স্বামীজী স্বাগত জানিয়ে গেছেন। বোধহয় এই শূদ্র-রাজত্বের রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনেই, প্রত্যাহের মৌখিক ভাষাকে, সত্যিকার গণবাণীকে সাহিত্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন স্বামীজী। কথ্য ভাষার সাহিত্যে সম্প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বামীজী শুধু পথিকৃৎই নন, বহু ব্যবহারে জীর্ণ আমাদের প্রত্যাহের লৌকিক ভাষার মধ্যে তাঁর মতো এমন শক্তির ও গতির সঞ্চার করতে পারেন নি কেউ। এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ এমন সবল, ওজঃশক্তিসম্পন্ন, এমন তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রত্যক্ষ ও মর্মভেদী এবং এত ধ্বনিময় বাংলা কথ্য ভাষার একমাত্র তুলনা মেলে তাঁরই গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের "কথামৃতে"। শুধু কথ্য ভাষা নয়—সাধু গদ্য ব্যবহারেও তাঁর অসাধারণ সাফল্য আমাদের মুগ্ধ করে। 'বর্তমান ভারত'-এর সাধু গদ্য সার্থকতার যে তুঙ্গশীর্ষ স্পর্শ করেছে—তা অতুলন। কোনো কোনো জায়গা, বিশেষ করে শেষ দিকের বহু বক্তব্য

কবিতার দীপ্ত ঐশ্বর্যে ঝল্‌মল্‌ করে উঠেছে। কোনো কোনো অংশ তো কবিতাই হয়ে গেছে—কবিতার মতোই ধ্বনিময় ও হৃদয়মন্থনকারী। "বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দ সেই অন্তহীন আত্মপ্রত্যয়—আমরাও তাঁর গতির বিদ্যুতে প্রাণস্পন্দিত"—সমালোচকের এই উক্তি কেবল তাঁর সাহিত্যভাবনা সম্পর্কে নয়—তাঁর ভাষা-বিপ্লব প্রসঙ্গেও সমান প্রযোজ্য। ভবিষ্যৎ বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ছিল। "যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর—বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। নিজের উপর বিশ্বাস রাখ—সমুদয় শক্তি তোর ভিতরে—এইটি জান এবং ঐ শক্তিকে অভিব্যক্ত কর। বল আমি সব করতে পারি। নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়। খবরদার, No নেই নেই; বল—হ্যাঁ হ্যাঁ, সোঽহং সোঽহং।"—বিশ্বাসের এই উদ্বোধনী মন্ত্র নিয়ে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্য ও ভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এগিয়ে যাবার উপদেশ দিয়ে গেছেন জাতিকে। "ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ"—স্বামীজী এই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ভাষাকে তিনি সাফ ইস্পাত করতে চেয়েছিলেন: "মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে করো—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।" কথ্য ভাষা প্রসঙ্গে বললেন: "দু'টো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু'হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই।" অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একথাও উচ্চারণ করেছেন: "ভাষা ভাবের বাহন। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। জাতীয় জীবনে নবচেতনার স্পন্দন এলে ভাবের জোয়ার দেখা দেয়। ভাষা তখন আপনি গতি শক্তি লাভ করে।" আবার শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলছেন: "বিশেষণ দিয়ে Verb-ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষায় বেশী জোর হয়—এখন থেকে ঐরূপ লিখতে চেষ্টা কর দিকি।" এবং নিজেও তিনি নিজের কাছেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: "বাংলা ভাষাটাকে নূতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করব।"—মোট কথা, সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেও এইসব কর্মপ্রয়াস ও প্রযত্নের পশ্চাতে একটিই লক্ষ্য ছিল—তা হল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন রচনা। মানুষ ও তার জীবন রচনার শ্রেষ্ঠতম কারিগর মানবজীবনের পূর্ণায়ত প্রগতির জন্যই ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। যে সাহিত্য আমাদের

বৃহতের অভিমুখে অভিযাত্রী করে, যে সাহিত্য পাঠে আমাদের চিত্ত-চেতনা বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, অপাবৃত হয় আমাদের অন্তর সত্তা এবং মানব-মানসের সর্বাত্মক উর্ধ্বায়ন ঘটায়—তাকেই আমরা বলি মহৎ সাহিত্য। আমরা মহৎ সাহিত্যের সেই ধ্রুব লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি বলেই—নিজে কলম ধরে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আমাদের তিনি পথ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এই কারণেই বিবেক-সাহিত্য মূলতঃ মননধর্মী। কল্পনার রামধনু-রঙ ছড়িয়ে তিনি কোনো সৃষ্টিধর্মী কাব্য-কাহিনী রচনায় কখনো সজ্ঞানে প্রয়াসী হননি। চলমান এই জগৎ জীবনের নানা সমস্যা ও তার সমাধান এবং পরিণামে সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই তাঁর জীবনের মতো তাঁর সাহিত্যেরও একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তা সত্ত্বেও, পেশাদার কবি সাহিত্যিক না হলেও, জীবন এবং জগৎজাত কোনো মহত্তম সত্যের অনুভব ও অভিজ্ঞতার বাঙ্‌ময় রূপই যদি কবিতা হয়, তাহলে বিবেকানন্দ অবশ্যই কবি। এবং যে অর্থে উপনিষদ কবিতা, সেই অর্থেই জীবন ও জীবনাতীতের মহৎ সাধক স্বামীজীর রচনায়ও সত্য-সুন্দরের প্রকাশ ঘটেছিল। উপনিষদের ঋষি-কবিদের মতো স্বামীজীও উপলব্ধির আনন্দে কবিতা রচনা করেছেন। তাই সেগুলি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে এবং কালোত্তীর্ণ।

মা বলতেন, "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন।" স্বামীজীও জানতেন কোন্ ভাবটি কোন্ ভাষায় কী ভাবে কোন্ প্রসঙ্গে কেমন প্রসঙ্গে কেমন করে পরিবেশন করতে হবে। তাই তিনি প্রয়োজনমতো সাধু, চলিত দুই ভাষাই সমান কুশলতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। একদিকে দুরন্ত আশাবাদের সঙ্গে নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়, প্রচণ্ড গতিময়তার সঙ্গে তেজ, বীর্য ও শক্তির সম্পন্ন সমাহার ঘটেছিল তাঁর সাহিত্যে, আবার অন্যদিকে পরিহাসরসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-হিউমার—সব ভাব, সব রসই তিনি অবলীলা-ক্রমে স্থান-কাল-পাত্রের বিচারে অসাধারণ নৈপুণ্যে, অপূর্ব সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। একজন মহৎ সাহিত্য-স্রষ্টা হিসেবে এখানেই তাঁর চূড়ান্ত কলাসিদ্ধি। একটি মাত্র ভাবেরই অভাব রয়েছে তাঁর রচনায়—সেটি ভয়। এবং জাতির চিত্ত-চেতনা থেকে এই ভয়কে তাড়াবার জন্যই তাঁর আজীবন সংগ্রাম। নিজে অত বড় সাহিত্য-স্রষ্টা এবং সর্বকলাশিল্প পারঙ্গম ছিলেন বলেই দেশের শিল্প-সাহিত্যে এবং জীবনের চারিদিকে

সর্বত্র এত দৈন্য, এত দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল তাঁর চোখে। বীর্য ও বলিষ্ঠ পৌরুষের পূজারী স্বামীজী তৎকালীন বাংলা কাব্যের মেরুদণ্ডহীন ললিতলবঙ্গলতা-মার্কা দুর্বলচিত্ত বাঙালী কবিদের অতি-লালিত্যে-বিগলিত কাব্য সৃষ্টিতে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে লিখলেন : "ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠি হ'য়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় হাঁসেন হোঁসেন করেন—ওরা কেন যাক না বাপু।" কিন্তু স্বামীজীর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। আজো ওরা যায় নি। আগাগোড়া কাপুরুষতায় ও ভ্রষ্টাচারে মোড়া চিঁহি চিঁহি কণ্ঠস্বরে মিহিমিহি ভাষণে তৎপর, ভূমিষ্ঠি হয়ে অবধি পিরীতের ও ভ্রষ্টাচারের গল্প-কবিতা শুধু নয়, অর্থহীন ব্যঞ্জনাহীন উচ্ছৃঙ্খল ও প্রতীকের যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রাণহীন স্পন্দনহীন নীরক্ত আঁতেলসাহিত্য রচনায় ব্যস্ত তিরিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি নিয়ে ঐ সব কবি সাহিত্যিকেরা তো আজো ছড়িয়ে আছে দেশের সর্বত্র ; শুধু ছড়িয়েই নেই, সাহিত্যের সংস্কৃতির আম-দরবারে ওরাই যে গ্রহণ করে আছে প্রধান ভূমিকা। তাই পরানুকরণের পরানুবাদের অন্ধ মোহে ইওরোপ-আমেরিকার পরিত্যক্ত পচা-গলা নোংরা সব আবর্জনা সাহিত্যের নামে সংস্কৃতির নামে এখন আমদানি করা হচ্ছে আমাদের দেশীয় সাহিত্যের অঙ্গনে। এবং বাস্তবতাব নামে বিকৃতকাম এই সব নোংরা আবর্জনা পরিবেশনের কায়দাকেই বর্তমানে সাহিত্যকীর্তি বলে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং শিরোপা ও পুরস্কার দেয়া হচ্ছে ঐ সব দুর্দান্ত সাহিত্য-স্রষ্টাদের। অথচ স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন :

"দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগ সকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিত হইয়া বসিয়া আছে —They idealise what is apparently real. পশুদিগের সহিত তাহাদিগের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি কখনোই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাঁহারা আপাত-নিত্য ভোগসুখাদিলাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শ-সকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে —They want to realise the ideal. ঐরূপ মানবই

যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে।" আবার অন্যত্র স্বামীজী এরকম মন্তব্য করেছেন: "যে জাতটা বড় materialistic, তারা nature-টাকেই ideal ব'লে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাব প্রাপ্তিকেই ideal ব'লে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর শক্তিসহায়ে শিল্পে express করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের nature-ই হচ্ছে primary basis of art; আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর Ideality হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ।" বলা বাহুল্য, এখানে উল্লিখিত ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর মধ্যেই আমাদের স্থান। অথচ আমরা শুধু প্রকৃতিকে নয় প্রকৃতির বিকৃতিকে বিকারকে ideal বলে ধরে বাস্তব সাহিত্যে ও শিল্পের নামে নরকগুলজার করে চলেছি। আমাদের চারুশিল্প-জগতে আজ চলেছে যেমন চূড়ান্ত নৈরাজ্য, অবক্ষয়ের অন্ধকারে দিশাহারা—সাহিত্যজগতেও ঠিক তাই। স্কেচ বা drawing-এর সামান্যতম জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাও না নিয়ে, perspective-এর কিছু রদ-বদল করে, এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক করে নিয়ে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য-চারুশিল্পের জগতে যেমন আমরা অনেকেই আবার এক একজন পিকাসো হয়ে উঠতে প্রয়াসী, ঠিক তেমনি সামান্যতম পড়াশুনা বা নিদিধ্যাসন ও প্রস্তুতি ছাড়াই অনেকে আবার আঙ্গিক প্রযুক্তি-প্রকরণের নানা জগাখিচুড়ি ও বিপরীত বিন্যাস ঘটিয়ে, ছন্দ এবং শব্দাবলীকে দুমড়ে মুচড়ে জীবনের বিকৃতি ও বীভৎসতাকেই উপজীব্য করে এক একজন দিক্‌পাল সাহিত্যস্রষ্টা বনে যাচ্ছি। শিল্প ও সাহিত্য জগতে আজকের এই ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা, মাৎস্যন্যায় ও নৈরাজ্যের অবক্ষয়ী অন্ধকার নরক থেকে বের হবার স্বামীজীই আমাদের একমাত্র আলোক-বর্তিকা। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট পথ-নির্দেশ আমাদের মনে পড়ে: "আহার-চালচলন-ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।" আরো মনে পড়ে ভাষা সম্পর্কে তাঁর সেই বিস্ময়কর আর্ষোক্তিগুলি:—"বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন—চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা

ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না।"

এর পরে যে উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করছি তা ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই অমোঘ: "পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষায় লোকে কয়।...যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালাদেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।"—

তবে যেহেতু ভাষা ও ভাব অর্থাৎ বাক্ ও অর্থ পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো নিত্য সম্পৃক্ত, সেইহেতু কেবলমাত্র ভাষার সাধনা করলেই হবে না। সমুন্নত বলিষ্ঠ মহান মানবিক ও দেবায়ত ভাবসমূহকে রূপ দান করতে হবে। যে ভাব সর্ব মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, যা একই সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বৃহৎ বিশ্বকে পরম শ্রেয় একটি মহৎ ঐক্যের দিকে নিয়ে যাবে তেমন ভাবটি গ্রহণ করতে হবে কবি-সাহিত্যিককে। কবিকে আমাদের ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব-শাস্ত্রে **"প্রজাপতি"** আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে, সার্থক সাহিত্য-স্রষ্টাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের নন্দনতত্ত্বেও কবি সাহিত্যিকের আছে একটি শ্লাঘ্য ভূমিকা। কবি শেলী তাঁদের বলেছেন 'unacknowledged legislators of the world"। কবি-নাট্যকার-প্রাবন্ধিক প্রভৃতি সাহিত্যস্রষ্টারা হলেন দেশের মুকুটবিহীন সম্রাটের মতো। সুতরাং অবশ্যই তাঁদের সামাজিক দায়ভাগ গ্রহণ করতে হবে, এবং মানবিক কর্তব্যও সম্পাদন করা উচিত। অর্থাৎ একই সঙ্গে মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি—দুই-ই তাঁদের অবশ্য কৃত্য। স্বামীজী এই সব কথাই নানা ভাবে নানা সুরে জীবনবাণীরূপে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

জীবনই ধর্ম এবং ধর্মই জীবন এই মহাবাক্য স্মরণ করে আমরা বলি—সাহিত্যও যেহেতু জীবনেরই একটি অংশ, জীবন থেকে জাত ফসল, তাই সাহিত্যকে অবশ্যই জীবন-অভিমুখী হতে হবে। এবং সে জীবন পূর্ণায়ত শ্রীতে ও মহত্তম শ্রেয়বোধে বিধৃত এবং সার্বিক মাঙ্গল্যচেতনায় সমুত্তীর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর সমন্বয়ী মহাজীবন। এবং সেই মহত্তম মহাজীবন ও মানব-বন্দনারই অন্য নাম সাহিত্য। এবং এমনি করে মানুষকে দেবতা করার অঙ্গীকারে সাহিত্য চিরকাল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্য সেই পরম কৃত্য পালন করে এসেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অক্ষম অপদার্থ উত্তরাধিকারী আমরা, তাঁদের দেশের মানুষ হয়ে, সেই পবিত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি, এবং এখনো ভঙ্গ করে চলেছি। সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাপ স্পর্শ করেছে আমাদের। বিশ্বাসঘাতকতার সেই মহাপাপ স্খালনের একমাত্র পথ—স্বামীজীর নির্দেশ মেনে—এই অন্ধকার আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে একই সঙ্গে এই জীবনের অভিমুখে আবার পদযাত্রী হওয়া। এ যেন সেই ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শিল্প-সাহিত্যের শুদ্ধ যীশুকে ক্রুশ-কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা। হ্যাঁ, আমরা তাই করেছি। এখনো হয়তো বা পুনরুত্থানের সময় আছে: আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা প্রভুর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারি মুক্তির পথে। জীবনকে ভালোবেসে, জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ গ্রহণ করতে পারি। তাঁর কৃপা হলে অতিক্রান্ত আমাদের স্বর্ণযুগের মতো হয়তো আবার এদেশের মানুষের হাতেই সত্যিকারের সাহিত্য—মানুষের সাহিত্য—বিরচিত হবে এবং পরিণামে সেই শুদ্ধ সাহিত্যই হয়তো একদিন আবার সত্যিকার মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে—এবং মানুষকে দেবতায় সমুত্তীর্ণ করে দিতে। সেই একমাত্র আমাদের অন্তিম ভরসা।

১০

রজোগুণের প্রয়োগ এবং দেশ ও জাতির সর্বাত্মক সমুন্নতি প্রসঙ্গে স্বামীজী

স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন : "তোদের দেশের mass of people (জনসাধারণ) যেন একটা Sleeping Leviathan (ঘুমন্ত বিরাট জলজন্তু)! তোমরা কি এই মৃত জড়পিণ্ডটার ভেতর, যাদের ভেতর ভালো হবার আকাঙ্ক্ষাটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নেই, যারা তাদের হিতৈষীদের ওপরই আক্রমণ করতে সদা প্রস্তুত, এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে পারো?" অন্যত্র আবার বললেন : "তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, ধমনীতে যেন আর রক্ত ছুটতে পারছে না, সর্বাঙ্গে paralysis (পক্ষাঘাত) হয়ে যেন এলিয়ে পড়েছে। আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, মস্তিষ্কে প্রতিভা নেই। কি হবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলো দ্বারা? আমি নেড়েচেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই। এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায়ই।"—এবং পরিশেষে স্বামীজী এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন : "আমাদের দেশের পক্ষে এখন প্রয়োজন লৌহবৎ দৃঢ় মাংসপেশী ও ইস্পাতের মতো স্নায়ু। এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি চাই, কেহই যেন উহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ না হয়, উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়—যদি বা এই কার্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয়, যদি বা সর্বদা সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়! ইহাই এখন আমার আবশ্যক।" "আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন যা বজ্রের উপদানে গঠিত।"

স্বামীজীর '3-H' ফর্মুলার কথা অনেকেই জানেন। Head, Hand and Heart অর্থাৎ মস্তিষ্ক, বাহু এবং হৃদয়ের যুগপৎ কর্ষণাই মানুষকে

যথার্থ মানুষ করে তুলতে পারে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও শারীরিক বল-বীর্য-শক্তির বিশেষ প্রয়োজন এই বাস্তব জগতে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হলে। তাই এক অধ্যায় গীতা পাঠের চেয়ে এক গেম ফুটবল খেলাকে এই দুর্বল জাতির পক্ষে অনেক বেশী জরুরী বলে স্বামীজী মনে করতেন। ঐহিক জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করার প্রয়োজনেই জাতির শরীরে বলাধান করার প্রয়োজন অনুভব করলেন স্বামীজী। সুস্থ সবল স্বাস্থ্যদৃপ্ত শরীরই সুস্থ সুন্দর মন-মনন, সংবেদনশীল মহৎ হৃদয় এবং প্রতিভাপূর্ণ মস্তিষ্কের নিয়ামক, একথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া শুধু গায়ের জোর এবং শক্তিরও প্রয়োজন আছে জীবনে।

তাই শুধু মাত্র সঙ্গীত, কারুকলা, ভাস্কর্য ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে জাতির উৎকর্ষ লাভেই স্বামীজী পরিতৃপ্ত নন। সবচেয়ে আগে বরং উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও শক্তিশালী দেহের অধিকার অর্জন করতে হবে জাতিকে। তাই দেখা যায়, স্বদেশবাসীর সর্বাত্মক কল্যাণ, সামগ্রিক প্রগতি ও উন্নতির প্রয়োজনে স্বামীজীর সর্বার্থসাধক পরিলেখ-প্রযোজনায় দেশের মানুষের ক্ষীণ দুর্বল স্বাস্থ্য ও স্বল্পতম আয়ুর সমস্যাটি এবং তার পুনরুদ্ধার-প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছিল। "অন্ন-প্রাণ-আলো-মুক্ত বায়ুর সঙ্গে বল, শক্তি, স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু" ফিরিয়ে আনতে জীববিজ্ঞানের সঙ্কর-প্রজনন (cross-breeding) তত্ত্বের সূত্রানুসারে জমে যাওয়া আমাদের স্থির নিশ্চল (stagnant) রক্তধারায় মুক্ত প্রাণের গতিবেগ সঞ্চারের জন্য তিনি নিজে "কটিতট কৌপীনবন্ত" "কাঞ্চনকামিনীবন্ধ" সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও ভারতবাসীর মধ্যে অসবর্ণ, আন্তঃপ্রাদেশিক, আন্তঃরাষ্ট্রিক, এমন কি আন্তর্জাতিক বিবাহেরও শুধু সমর্থন নয়, সুপারিশ করে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর শোনা যাক: "ভারতবর্ষে inter-marriage (অন্তর্বিবাহ)-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।" সেই ঘোষ-বোস-গুহ-মিত্র, সেই চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে-মুখুজ্জে আর গাঙ্গুলী-ঘোষালের মধ্যে বিয়ে হতে হতে রক্ত আমাদের ঝিমিয়ে গেছে। তাই তিনি পুনর্বার বললেন: "আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশো" বছর ধ'রে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগও

এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে চলাফেরা করেই রক্তটা দূষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোনো রোগের বীজকে resist করবার (বাধা দেবার) ক্ষমতা ওসব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্য রকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের active (কর্মঠ) হবে।" আধুনিক জীববিজ্ঞানেও এই সত্য সমর্থিত।

শুধু তাই নয়, পূর্বোক্ত ঐ সব ঐহিক সমুন্নতির কারণেই জীবন সংগ্রামে স্বজাতিকে জয়ী করে তুলবার জন্যই, বিশেষ করে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং প্রত্যহ জীবন-চর্চায় স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা নিয়ে আসার প্রয়োজনে জাতির জাগতিক উন্নয়নের জন্য বিরচিত তাঁর মহৎ পরিকল্পনায় সেই যুগেও জনবিস্ফোরণ-সমস্যা এবং তার সুস্থ সহজ সমাধানের প্রশ্নটি সমান মর্যাদায় তিনি তুলে ধরেছেন। বিবাহ সম্পর্কে স্বামীজীর এই বিপ্লবী চিন্তা আজো আমাদের বিস্মিত করে। স্বদেশপ্রেমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা কী পর্যন্ত হলে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সব জাগতিক জাতীয় সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং তার একান্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাধান বা পথ-নির্দেশ করা সম্ভব হয় তা আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সে যুগের সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বামীজীর এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে স্বাগত জানানো সম্ভব ছিল না। তাই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ কর্তৃক এই সব বৈজ্ঞানিক বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল সেদিন। কেউই সেদিন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি স্বামীজীর এই সব মতবাদ এবং উপদেশাবলী। কারণ এ সব বক্তব্য তো হিন্দুধর্মের তথাকথিত মূল ভিত্তি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার উপরই চরম আঘাত হানা। বিশেষ করে অসবর্ণ বিবাহ মেনে নিলে তো জাতিভেদ প্রথাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অনুলোম প্রতিলোম প্রভৃতি নানা বিধান ও অনুশাসনে অচলায়তনের দ্বাররক্ষী পুরোহিতকুলের স্বার্থে এখনো টিকে আছে যে জাতিভেদ-প্রথা, তাহলে সে সব তো শূন্যে মিলিয়ে যায়। তাই পুরোহিত শ্রেণী এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা সেদিন তাঁদের মতে এই ভয়ানক মতবাদের বিরোধিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। আজো নব্বই বছর পরেও কি এই

অ্যাটম-ভোস্তক-ইনসাটের যুগে আমরা সহজভাবে এই অসবর্ণ বিবাহকে মেনে নিতে পেরেছি? অথচ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ-গ্রন্থের প্রজ্ঞাবান সমালোচক শ্রদ্ধেয় স্বামী ধ্যানানন্দের ভাষায়, "স্বামীজীর প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা একটি সামাজিক প্রথা মাত্র। তা সনাতন নয় এবং সেই কারণে সনাতন ধর্মের সঙ্গে তার কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। বহুবার তিনি একথা বলেছেন।"—এ সম্পর্কে স্বামীজীর নিজের বক্তব্য অতঃপর স্মরণ করা যাইতে পারে: "পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতিভেদ একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া আর কিছুই নহে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়।"—এবং এই জন্মগত জাতিভেদপ্রথা ও ছুঁৎমার্গের সঙ্গে যে আমাদের কোনো সংস্রব নেই, তাও স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন। কারণ এর কোনোটাই শাস্ত্রসম্মত নয়। তাই একে স্বামীজী "প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটি কুসংস্কার" বলে চিহ্নিত করেছেন।

এতো দিন আগে জনবিস্ফোরণ সমস্যা নিয়েও স্বামীর চিন্তাভাবনা তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক কোনো উন্নয়ন বা প্রগতিই সম্ভব নয়—সেই যুগে দাঁড়িয়ে এই অর্থনীতি বিজ্ঞানের বাস্তব-জীবন-সত্য যে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্বামীজী—এ তাঁর অসাধারণ দেশপ্রেম, প্রতিভা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করছে। অথচ আজকের বর্তমান সমাজে এই সমস্যা যে ভীষণ ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী হয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এখনও তা আমরা অনেকেই সম্যক ভাবে বুঝতে পারছি না। পরিবার-পরিকল্পনার প্রশ্ন নিয়ে তাই এদেশে এখনো রাজনীতি হচ্ছে। চরম দুর্ভাগ্য আমাদের।

স্বীয় গুরুদেবের—একটি দুটি সন্তান হবার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপনার নির্দেশ, এবং জগজ্জননী শ্রীমা সারদার সেই নির্মম ভর্ৎসনা: অনেকগুলি ছেলে পেলে হয় যার ঠাকুর তাকে গ্রহণ করতেন না। একটা দেহ হ'তে আম কাঁঠালের মতো পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে! ওরা কি মানুষ?—"সংযম নেই, কিছু নেই যেন পশু!" স্মরণ করে—

ত্যাগের দ্বারা ভোগকে শোধন করার মহামন্ত্র (ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥)—দীক্ষা গ্রহণ করে স্বেচ্ছা-সংযমের পটে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পথকেই স্বামীজী—ভারতীয়দের পক্ষে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন এবং এই পদ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিক আদর্শের কথা ছেড়ে দিলেও, "যুক্তাহারবিহার" —অর্থাৎ পরিমিত আহার-বিহার-নিদ্রা প্রভৃতি ভোগের মধ্য দিয়ে সংযম শ্রীতে উদ্ভাসিত যথোচিত নিয়ম-নীতির অনুবর্তনে দিন যাপনই যে সব চেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-পদ্ধতি—এবং এ পথেই যে সমস্ত দুঃখ জয় করে মানুষের পক্ষে হয়ে ওঠার সাধনায় (life becoming) নিজেকে যুক্ত করা সম্ভব, —আধুনিক জীববিজ্ঞানও সে কথাই বলে। যথেচ্ছভাবে মাত্রাহীন ভোগের মধ্য দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন যে মানব-সন্তানের পক্ষে গ্রাহ্য হতে পারে না—তা মানুষের দেহযন্ত্রের নির্মাণ-পদ্ধতিই সাক্ষ্য দিচ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা যখন বলেন: ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপ্রজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥—তখন এর মধ্যে আমরা একালের এবং চিরকালের শাশ্বত জীবন-বাণী শুনতে পাই। এবং এই কারণেই সোপেনহাউয়ার প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত দার্শনিকবৃন্দই নন, সাধারণ মানুষও যুগে যুগে এই মহাগ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সমস্ত দুঃখের পরম শান্তি ও সান্ত্বনা.—নৈরাশ্যের অন্ধকারে অপার্থিব আলোর আশ্বাস। বিষয়ের প্রতি অন্ধ আসক্তি এবং মোহময় বাসনার আকর্ষণই যে জীবনের সকল দুঃখ-যন্ত্রণার উৎসমূল একথা তো চরম বাস্তববাদীরও চূড়ান্ত জড়বাদীর কাছেও স্বীকৃত নির্মম সত্য। বড় ধরণের শিল্প-সাহিত্য রচনা করতে কিংবা বৃহৎ কোনো কর্ম-সম্পাদনেও বিবিক্তি বা detachment অর্থাৎ নির্লিপ্তি বা অনাসক্তি চাই। বৃহত্তর অর্থে সার্থক জীবনরচনার ক্ষেত্রেও তাই। ঠাকুর-স্বামীজী দুজনেই এই মহাগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন বার বার। কিন্তু অনাসক্তি বা বিবিক্তি আয়ত্তে আনা কি এত সহজ ব্যাপার? বললেই তো আর আসঙ্গলিপ্সা বা কামনা বাসনা চলে যাবে না! তাছাড়া সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ বাসনা বর্জন করে থাকবে বা কী নিয়ে? এই বিশাল সৃষ্টিধর্মের বা কী পরিণতি হবে?—তাই ভারতদর্শন বাসনার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির বা বিলয়ের

ঘোষণা না করে উদ্‌গতির কথাই বার বার বলে গেছে। Instinct বা সহজাত সংস্কারের নির্মূলীকরণ (extinction বা annihilation) যখন সম্ভব নয়—তখন উদ্‌গতি বা sublimation-এর পথই সাধারণ মানুষের জন্য, সমগ্র সমাজের জন্য একমাত্র গ্রাহ্য পথ। আধুনিক মনস্তত্ত্বও একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে ভারতবর্ষ-নির্বাচিত এবং অনুসৃত এই উদ্‌গতির পথই মানুষের হয়ে ওঠার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পথ—বরং বলা চলে একমাত্র বাঁচার পথ। এই বাঁচার পথেরই সন্ধান দিয়ে গেলেন শাশ্বত ভারতাদর্শ অনুসরণ ও অনুবর্তন করে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাময়ী-বিবেকানন্দ। এবং এপথ আজকের জীবন ও বর্তমান সমাজের পক্ষেও সমান উপযোগী।

১১

মানবিক সম্পর্কের উন্নয়নে কর্ম-পরিণত বেদান্তবাদ

মানব-সভ্যতার ঊষা-লগ্ন থেকেই মানুষে মানুষে কী রকম সম্পর্ক হবে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির কী রকম যোগাযোগ হবে, সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সহযোগিতার সম্পর্ক কী রকম হবে—ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও অধিকার প্রসঙ্গ—এ সব নিয়ে মানুষের মহৎ জ্যেষ্ঠেরা চিরকাল চিন্তা-ভাবনা করে আসছেন, দেশে বিদেশে প্রজ্ঞাবান মনীষীরা এই সব সমস্যার সন্ধান করে গেছেন। বস্তুতঃ ব্যক্তি ও সমাজের সুস্থ সহজ সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে সভ্যতার উৎকর্ষ ও সার্থকতা। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সম্পর্ক, লেনদেন ও ভাব-বিনিময়ের প্রশ্ন নিয়েও মানুষ অনেক ভেবেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যথার্থ আদর্শ মানবিক সম্পর্ক স্থাপনার প্রয়াসে মানুষের চলেছে অবিরাম তপস্যা। মানুষ স্বপ্ন দেখেছে সব মানুষের সমান অধিকারের, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বিশেষ অধিকার বা সুবিধাবাদের অন্যায় প্রয়োগের বিরুদ্ধে। মানুষে মানুষে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একটি সহজ সুন্দর প্রীতি ও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হোক; সার্থক হোক এক বিশ্ব—এক রাষ্ট্র—এক মানবিকতার কল্পনা—এসবই দেশে বিদেশে মহৎ মানুষেরা আকাঙ্ক্ষা করে গেছেন। বিশ্বব্যাপী সব মানুষের মধ্যে এই সহজ সুন্দর সম্পর্ক

স্থাপনার প্রয়োজনে স্বামীজী প্রয়োগ করেছেন কর্ম-পরিণত বেদান্তকে। বনের বেদান্তকে ঘরে.ঘরে এনে স্থাপিত করে সব সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। সর্বত্র সকলের মধ্যে সেই অদ্বয় 'একক' দেখার সাধনা প্রবর্তন করে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছেন মানব সমাজের সার্বিক প্রগতি ও বিশ্বশান্তির পথ। এবং এ পথেই তাঁর আজীবন পরিক্রমা। বললেন: "বেদান্ত এক বিশাল পারাবার বিশেষ, যাহার উপরে একটি যুদ্ধজাহাজ ও একটি ভেলার পাশাপাশি স্থান হইতে পারে। এই বেদান্ত মহাসাগরে একজন প্রকৃত যোগী, একজন পৌত্তলিক বা এমনকি একজন নাস্তিকের সহিতও সহাবস্থান করিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বেদান্ত মহাসাগরে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী সব এক—সকলেই সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান।" কিন্তু সবচেয়ে আগে স্বামীজী দৃষ্টি দিলেন নিজের প্রিয় জন্মভূমি স্বদেশের দিকে। দীর্ঘকাল পরিব্রাজকের জীবন গ্রহণ করে ঘুরে ঘুরে তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষকে—তার মানুষকে। দেশের মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্য-দুঃখ এবং অধঃপতন দেখে শিউরে উঠেছেন তিনি বার বার। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছেন নিদারুণ অসঙ্গতি, সমস্ত রকম মানবিক সম্পর্কের কী সর্বনাশা অবমূল্যায়ন, দুর্লভ মানব-সম্পদের কী ভয়াবহ নির্মম অপচয়!—মানুষে মানুষে এ কী ব্যবধান, দুরূহ দুর্লঙ্ঘ্য সব বিভেদের প্রাচীর! একদিকে স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য ও কুবেরের রত্নভাণ্ডার, আর একদিকে অন্নহীন বস্ত্রহীন নিরাশ্রয় লক্ষ লক্ষ মানুষের পশুর মতন জীবন যাপন। একমুঠো অন্নের জন্য সে কি সকরুণ আর্তনাদ, দুঃসহ হাহাকার! একদিকে উচ্চবর্ণের মানুষের অর্থহীন আকাশ-চুম্বী দম্ভ ও নির্লজ্জ নগ্ন আভিজাত্য, আর একদিকে চির-নির্যাতিত নিপীড়িত নিম্নশ্রেণীর সহায়-সম্বলহীন মানুষের আর্ত ক্রন্দন ও ক্রম-অবলুপ্তি। মানুষের প্রতি মানুষের নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ এবং নিরন্তর অপমান ও অবহেলায় মানুষের এসব অমানবিক শিশুঘাতী, নারীঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী কুৎসিত পৃথিবীতে মানুষের পশুর মত জীবনযাপন দৃশ্য তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছেন সারা ভারতবর্ষ ঘুরে। তারপর তিনি লক্ষ্য করেছেন পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীজাতির প্রতি কী নিষ্ঠুর অবহেলা ও নির্যাতন। সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এদিকে। নতুন ভারতবর্ষকে জাগাতে হলে চাই ঘরে-বাইরে সর্বত্র সহৃদয় মানবিক সম্পর্কের উপস্থাপনা। ঘৃণা

নয়, বিদ্বেষ নয়, অবহেলা নির্যাতন নয়, প্রসারিত করতে হবে সকলের জন্য প্রীতি ও প্রেমের প্রসন্ন অনুভব। রচনা করতে হবে ভারত জুড়ে একটি প্রেমের পবিত্র সংসার। সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে সহজ মানবিক সম্পর্ক স্থাপিত না হলে সে জাতির মুক্তি অসম্ভব। তাই বললেন, "জগতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার। সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের উদ্যোগ।" আবার বললেন, "শক্তি বিনা উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে।...শক্তির কৃপা না হলে কী ঘোড়াব ডিম হবে। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখেছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে।" "মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড হয়েছে। যে-দেশে যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ—সে জাত কখনও বড হতে পারেনি, কস্মিন্‌কালে পারবেও না।" মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?" নারীকে সমমর্যাদায় সমাজে প্রতিষ্ঠা না দিয়ে, নিত্য নানা নির্যাতন ও অবহেলা করে এবং তাদের পুত্র-উৎপাদনের যন্ত্রে (Son-producing machine) পরিণত করে আমরা যে পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হচ্ছে। জাতির উদ্দেশে যেন অভিশাপ বর্ষণ করে বললেন: "শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসী স্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে...আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম মহাহেয় অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।"

অতঃপর দুঃখ করে আপসোস করে আবার বললেন: "এদেশে পুরুষ মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস?" পুরুষ সমাজকে

লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন : "তোমরা মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।"—পরিশেষে নিজেই এগিয়ে এসে নারীজাতির উন্নয়নের পথ-নির্দেশ দান করলেন : "নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পাবে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা লাভে সমর্থ।"

শুধু পুরুষ-নারীর সম্পর্কেব এই বিদীর্ণ বিপন্ন চেহারাই নয়, তাছাড়া রয়েছে দরিদ্র-বড়লোকের পার্থক্য, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের মধ্যে বিভেদ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যের আসমান জমিন ফারাক, শহব ও গ্রামের মধ্যে অপরিচয়ের দুস্তর ব্যবধান, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতি ও হরিজনদের সংঘর্ষ, হিন্দু-শিখের কলহ-সংশয়, আর্যাবর্ত-দক্ষিণাপথের সংঘাত—এসব দিকেই তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি জানতেন, "অনেক সমস্যা আছে—সমস্যাগুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্যা নেই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে যাহার সমাধান না হইতে পাবে।" শিক্ষার মাধ্যমেই সব দুঃখের অবসান হবে। শিক্ষা, শিক্ষা, শুধু সকলের জন্য শিক্ষা চাই।

হিন্দুর ধর্ম ভাতের হাঁড়িতে; সবাই আমরা ছুঁৎমার্গী। তাই আমাদের এই অধঃপতন। বাঁচতে হলে সর্বত্র সেই "এক" ব্রহ্ম বা আল্লা বা ঈশ্বরকে দেখার সাধনা গ্রহণ কবতে হবে। "কারণ ছুঁৎমার্গের সহিত আমাদের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। উহা হিন্দুধর্ম নহে, উহা আমাদের কোনো শাস্ত্রে নাই, উহা প্রাচীন আচারের অননুমোদিত একটি কুসংস্কার, আর চিরদিনই উহা জাতির অভ্যুদয়ে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের কথা ভেবে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন। ইতরসাধারণকে অবহেলা করা এবং নারীজাতিকে অসম্মান করাই যে আমাদের সবচেয়ে বড় জাতীয় পাপ তা তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে একটি সহজ প্রীতি ও প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে তিনি

নানাভাবে প্রয়াস করে গেছেন। প্রেমই হলো জাতীয় সংহতির মূলকথা। এবং এই সংহতি ছাড়া তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়ে উঠতে পারবে না জেনে— এই সংহতি স্থাপনার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে গেছেন। কোথায় আমাদের ত্রুটি, কোথায় আমাদের অপরাধ এবং কোথায় আমাদের শক্তি, তাও তিনি বলে গেছেন। দেশের মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-হানাহানি দেখে কখনো ব্যথিত, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে স্নেহময় পিতার মতো ভৎর্সনা করেছেন, বন্ধুর মতো এইসব ক্ষুদ্রতার বন্ধন থেকে মুক্তির সন্ধান দিয়ে গেছেন। কী আমাদের কৃত্য তা আমাদের বলে গেছেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ ও হিংসা-হানাহানি তার নিরাময়ের পথও আমাদের দেখিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে গুরুর সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ আমাদের মনে পড়ে: "সকলকে ভালোবাসবে মিলে মিশে যেন এক হয়ে যাবে— বিদ্বেষভাব আর রাখবে না। ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু ও মুসলমান ও খৃষ্টান— এই বলে নাক সিঁটকে ঘৃণা ক'রো না।" (কথামৃত) আর জীব-শিব বা জীব-ব্রহ্ম-তত্ত্বে বিশ্বাসী স্বামীজীর ভারতবর্য তো হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন-পার্শী-শিখ সকলের সম্মিলিত দেশ। তাই শুধুমাত্র হিন্দুদের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন জন-গোষ্ঠী জেলে-মালা-মুচী-মেথর-মুদ্দাফরাস-চণ্ডাল-হরিজন—এঁদের প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল না তাঁর সহানুভূতি, তাঁর প্রীতি-ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা। শুধু তাঁদেরই তিনি নিমন্ত্রণ করেন নি—জাতীয় কর্ম-যজ্ঞে মিলিত হতে, জাতীয় নব-নির্মাণের পবিত্র দায়ভাগ গ্রহণ করে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে, পরন্তু সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতিও গুরু-শিষ্য উভয়েরই প্রসারিত ছিল প্রীতি-প্রেমের আলিঙ্গন; বরং বলা চলে পরম ঐক্য ও একাত্মবোধে যুক্ত ছিলেন তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গেও এবং তাঁদেরও আহ্বান করেছেন যৌথ প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় নতুন ভারতবর্ষ রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। কারণ সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরেই যে অভিষেক সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী তাঁর প্রিয় দেশ-মাতৃকার, হিন্দু-মুসলিম-জৈন-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-শিখ—সকলেরই পরম পূজ্যা ভারতজননীর। গুরু যে শুধু ইসলামের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাই নয়, ঈশ্বরীকে তিনি একদা এক মুসলমানরূপেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কথামৃতে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ

নিজেই বলছেন: কাল মাকে দেখলাম। গেরুয়া জামা পরা…। আর একদিন মুসলমানের মেয়েরূপে (জগজ্জননী মা) আমার কাছে এসেছিলেন।" (কথামৃত চতুর্থভাগ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। বস্তুতঃ গুরুর মতোই ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজের প্রতি সমান প্রীতি ও প্রেমপূর্ণ সহানুভূতিশীল এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন শিষ্য তাঁর সমগ্র জাতি-গঠনের মহান কর্মযোজনায় ইসলাম এবং অন্যান্য সকল ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও শ্রেণীর মানুষকে শামিল করে গেছেন। বস্তুতঃ হিন্দুদের সঙ্গে খ্রীষ্টান, ইসলাম এবং অন্যান্য সকল ধর্মের মানুষকেই সমমর্যাদায়—নিজেরই প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মহাসঙ্ঘে গ্রহণ করে স্বামীজী ভবিষ্যৎ-ভারতের পথ-নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং এইভাবেই ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন একজাতি—একপ্রাণ—একতা তত্ত্বের। স্বামীজীর কাছে আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব বহিরঙ্গ ধর্মের প্রশ্ন ছিল একান্তই অবান্তর; শুদ্ধ মানবতা ও মানবধর্মই একমাত্র বিচার্য। পরবর্তীকালে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি নজরুলের অসাধারণ সেই কাব্যপংক্তি: "হিন্দু না ওরা মুসলিম—ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন? কাণ্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।" —এ তো স্বামীজীরই শুদ্ধ জাতীয়তাবাদের মহান ভাবাদর্শেরই প্রতিধ্বনি। তাছাড়া স্বামীজীর কাছে 'হিন্দু' কোনো ধর্মীয় শব্দ নয়, তাঁর কাছে 'হিন্দু' ও 'ভারতীয়' কথা দুটি সমার্থক। (ভারতে বিবেকানন্দ ১৩শ সংস্করণ, ৩২—৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) আমাদের এই দেশে যুগ যুগ ধরে যাঁরা অবিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে আসছেন এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি উদার ঐক্যবোধে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত, শুদ্ধ মানবতাই যাঁদের উপাস্য—স্বামীজীর মতে তাঁরাই হিন্দু বা ভারতীয়।

ইসলাম সম্পর্কে স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তিগুলি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে: "আমার দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণভাবে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে।" আবার অন্যত্র—"আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম-ধর্মরূপ দুই মহান মতের সমন্বয়ই—একমাত্র আশা। আমি মানসচক্ষে

দেখিতেছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া…মহামহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।" আবাব বললেন: অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা,—কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে।…উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানোর কৃতিত্বটুকু পাইতে পারে,…কিন্তু কর্ম-পবিণত বেদান্ত যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সর্বজনীনভাবে এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই। পক্ষান্তরে…কখনও যদি কোনো ধর্মেব লোক দৈনন্দিন ব্যবহাবিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র ইসলামধর্মের লোকেরা আসিয়াছে;…কিন্তু ইসলাম-পন্থিগণ সে-বিষয়ে সাধারণত সচেতন নয়। ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—বলে—মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখে এ সমস্যার সমাধান হবে না। গুরু ইসলাম ধর্মের সাধনা কবে এবং শিষ্য ইসলাম ধর্মীয়দের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্থান দিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের পথ নির্দেশ দিয়ে গেলেন—একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর যীশুখ্রীষ্ট এবং তাঁর ধর্ম সম্পর্কে তো স্বামীজীর শ্রদ্ধার অন্ত নেই। তাঁর বিখ্যাত রচনা "ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট" ছাড়া খ্রীষ্ট ও তাঁর ধর্ম প্রসঙ্গে আরো পাঁচটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায় স্বামীজীর বাণী ও রচনায়। এ ছাড়াও তাঁর বক্তৃতায় ও পত্রাবলীতে নানা উপলক্ষ্যে অসংখ্যবার প্রভু যীশুর উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি ও আনুগত্য নিবেদন করে গেছেন স্বামীজী। গুরুর খ্রীষ্টধর্ম সাধনা এবং যদু মল্লিকের উদ্যানবাটীতে শিশু যীশু ও মা ম্যাডোনার ছবি দেখে তাঁর ভাব সমাধি এবং শ্রীঈশার দর্শন লাভ এবং তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের মানসলোকে একীভূত হয়ে যাওয়ার কাহিনী আজ আর কারো কাছে অবিদিত নেই। খ্রীষ্ট প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিও স্মরণীয়: "যিনি রাম, কৃষ্ণ, ক্রাইষ্ট, চৈতন্য—ইদানীং তিনিই রামকৃষ্ণ।" কিংবা "সেই একই অবতার। যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, আবার ওখানে যীশু হলেন।" এমনিভাবেই ঈশদূত যীশুখ্রীষ্টকে গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করে দেবতার স্বর্ণসিংহাসনে রাজ-রাজেশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন গুরু-শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাই স্বামীজী প্রত্যেক ক্রিসম্যাস সন্ধ্যায় মহান

মানবপুত্রের চরণবন্দনার ধারা প্রবর্তিত করে গেলেন। এবং সেই ধারার অনুসরণে আজো রামকৃষ্ণ মিশনের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে খ্রীষ্টজন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়ে আসছে। খ্রীষ্টান মুসলমান-প্রভৃতি সকল ধর্মের মানুষকেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সন্ন্যাসে দীক্ষারও অনুমোদন করে গেছেন স্বামীজী, একথা আগেই উল্লিখিত। বস্তুতঃ পূর্বাশ্রমে খ্রীষ্টান, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহু সন্ন্যাসী রয়েছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে।

১২

স্বামী বিবেকানন্দের ভারতচেতনা

প্রসঙ্গতঃ একথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে চিন্তায়, কর্মে ও কথায় স্বামীজীর সমগ্র জীবনসাধনা 'ভারতবর্ষকে' কেন্দ্র করে। সমগ্র ভারতবর্ষই আরাধ্যা জননীরূপে তাঁর মানসলোকে নিত্য অধিষ্ঠিতা। অন্ধ্রী, কেরলী, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, উৎকলী, গুজরাতী, মারাঠি, আসামী—এ আমাদের সত্য পরিচয় নয়। "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই…" এই পরিচয়েই আমাদের গৌরব, আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব। স্বামীজী তাই চিরকাল নিজেকে ভারতবাসী বলেই পরিচয় দিয়ে গেছেন। এবং তাঁর জীবনের সমগ্র কর্ম-প্রযোজনাও এই অখণ্ড ভারতকে কেন্দ্র করে। এবং এই ভারত-জননীর পদপ্রান্তেই সমগ্র ভারতবাসীর সর্বাত্মক বন্ধন বিমোচনের প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে গেছেন স্বামীজী। তিনি শুধু বঙ্গবাসী, গুজরাতী, মারাঠি বা তামিলনাড়ুবাসী বা কর্ণাটকীদের পরিত্রাতা নন, তিনি একাধারে সমগ্র ভারতভাগ্যবিধাতা এবং বিশ্ব-জনগণ-মন-ঐক্য-বিধায়কও বটে।

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষায় তাই স্বামীজী বললেন, "ভারতের পতন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে ভারত নিজ কার্যক্ষেত্র সংকুচিত করিয়াছিল, শামুকের মতো দরজায় খিল দিয়া বসিয়াছিল, আর্যেতর অন্যান্য সত্যপিপাসু জাতির নিকট নিজ রত্নভাণ্ডার, জীবনপ্রদ সত্য-রত্নের ভাণ্ডার, উন্মুক্ত করে নাই।" "আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম, ভারতকে যদি আবার

উঠিতে হয় তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে। এবং পরিবর্তে অপরের যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রসারণই জীবন—সংকীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু। ভারতে যেদিন থেকে "ম্লেচ্ছ" শব্দের সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই ভারতবর্ষের অধঃপতন শুরু—এও তাঁরই সতর্কবাণী।

১৩

ইতর সাধারণের প্রতি অবহেলা ও নারীনির্যাতন প্রসঙ্গ

দরিদ্র দুঃখী অসহায় নির্যাতিত মানুষের জন্য নিত্য উদ্বেলিত তাঁর বড় হৃদয়ের অশান্ত ক্রন্দন ও হাহাকার আজো আমরা শুনতে পারি তাঁর রচনাবলীর মধ্যে, তাঁর চিঠিপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। প্রজাপুঞ্জই যে দেশের সমস্ত শক্তির একমাত্র আধার এবং সে শক্তিকে নিষ্পেষিত করে আমরা যে নিজেদেরই চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছি একথা তিনি বার বার বলে গেছেন। "এই যে চাষাভূষো, মুচি-মুদ্দাফরাস—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা চিরকাল নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধনধান্য উৎপন্ন করেছে, মুখে কথাটি নেই।" সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের সতর্ক করে দিয়েছেন, "তোদের মতো তারা কতকগুলো বই-ই না-হয় না পড়েছে। তোদের মতো শার্ট-কোট পরে সভ্য না হয় নাই হ'তে শিখেছে। তাতে আর কি এল গেল। কিন্তু এরাই হ'চ্ছে জাতের মেরুদণ্ড সব দেশে। তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে সমগ্র জাতির সর্বনাশ ডেকে এনেছে। নীরবে সহস্র সহস্র বছরের অত্যাচার সহ্য করে এইসব ইতর-সাধারণ মানুষ অর্জন করেছে অপার সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। নিপীড়িত নিত্য-নির্যাতিত এই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বার বার বন্দনা-গান রচনা করে সমগ্র জাতির কাছে তুলে ধরেছেন তার কর্তব্যের

কথা। বলেছেন: পড়েছ, মাতৃদেবো ভব; পিতৃদেবো ভব। আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র-মূর্খ-অজ্ঞানী-কাতর, ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে। "ঐ যারা চাষাভূষা-তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য—বিজাতিবিজিত স্বজাতি-নিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্ছে না।" প্রায় নব্বই বছর আগে স্বামিজী একথা বলেছিলেন। অথচ আজো কি এসব কথা প্রায় সমান সত্য নয়? স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন, "জীবন সংগ্রামে সর্বদা ব্যস্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের এতদিন জ্ঞানোন্মেষ হয়নি। এরা মানববুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ করে এসেছে, আর বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রম ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে।" বুদ্ধিমান চতুর লোকেরা আজো কি ভারত জুড়ে এদের প্রায় সমানভাবে শোষণ করে যাচ্ছে না? "ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য।···পুরোহিত শক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ।" "ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা।" "ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপী-গণের সাহায্যকারী কোনো বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর ক্রমাগত যে আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না—কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে।" তারা "নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি, মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান, শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ/ রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ বাড়ে,/সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,/নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,/ দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে/মরে সে নীরবে।" "বেদান্তের এই জন্মভূমিতে সাধারণ লোককে শত শতাব্দী যাবৎ এইরূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এমন হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে—তাহাদের স্পর্শে অশুচি,

তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি!" তাহাদিগকে বলা হইতেছে, "নৈরাশ্যের অন্ধকারে তোমাদের জন্ম—থাকো চিরকাল এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে।" আর "স্মৃতিফ্রতি লিখে নিয়মনীতিতে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine করে তুলেছে!" "আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা !!! প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—বুড়ো মনু বলেছেন। আর প্রভু বলেছেন: ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী—ইত্যাদি। আর আমরা বলছি:—"দূরমপসর রে চণ্ডাল," "কেনৈষা নির্মিতা নারী মোহিনী।"—এইসব উদ্ধৃতির মধ্যে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ, নিম্নবর্ণের নির্যাতিত অচ্ছুৎ চণ্ডাল-মুচি-মেথর-হরিজন এবং নিত্য পদদলিত নারীজাতি সম্পর্কে স্বামীজী যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন—আজ এই স্বাধীন ভারতবর্ষেও তাদের নির্যাতিত সমাজের ভাইবোনদের কি আমরা সেদিনের সে নিদারুণ দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পেরেছি? খুব বেশী দূর এগোতে পেরেছি বড় জীবনের অভিমুখে? আজো কি এদেশে লক্ষ লক্ষ বেগার শ্রমিক শোষিত হচ্ছে না? হরিজনদের উপর অবিরাম নির্যাতনের কাহিনী তো রোজই প্রায় আমরা সবাই সংবাদপত্রে দেখছি। শুনছি অচ্ছুৎ অসহায় নিম্নবর্ণের মানুষের এখনো দলে দলে ধর্মান্তরণের করুণ কাহিনী। দশ বছরের মেয়ের আজ আর হয়তো খুব বেশী বিবাহ হচ্ছে না—কিন্তু পণ-প্রথার নিষ্পেষণ তো সমান ভাবে চলেছে। নিত্য কাগজ খুলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি বধূ-নির্যাতনের অজস্র নির্মম কাহিনী। বস্তুতঃ এ দেশে এই পুরুষ-শাসিত সমাজে বধূ-বলি প্রাত্যহিক ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। তাছাড়া কোনো সমস্যারই কি আমরা যথার্থ সমাধান করতে পেরেছি? পারিনি। কারণ আমরা তাঁর কথা শুনিনি। "জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা"। সে পন্থা গ্রহণ করিনি আমরা। স্বামীজী বলেছিলেন, "কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা! ইউরোপের বহু নগরী পর্যটন করিয়া তাদের দরিদ্রেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় অশ্রু বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা,—জবাব পাইলাম। শিক্ষা-বলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়-বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া

উঠিতেছেন ; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সংকুচিত হইতেছেন।" "দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি নিম্নশ্রেণীদের শিক্ষা দিতে পারো, তাহলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে? বিদ্যা শেখাতে পার?" একা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আর সামান্য তার লোকবল ও ধনবল নিয়ে কতটুকু করবে? আজ তো দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ কি এসব কথা জানেন না, জানেন না শিক্ষা বিস্তারের মহৎ পরিণামের কথা? তবুও কেন আটত্রিশ বছরের স্বাধীনতার পরে এখনো ৩৬% ভাগ লোক শিক্ষিত? এখনো কেন ভয়াবহ বেকারসমস্যা আমাদের দেশের তরুণদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে? নারীশিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন: "তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছিস, কিন্তু যারা তোদের সুখদুঃখের ভাগী, সকল সময়ে তোদের প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—, তাদের উন্নতি করতে তোরা কি করছিস?" "মেয়েরা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হলে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।" শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু কিছু মহিলা হয়তো এতদিনে শিক্ষালাভ করে জীবিকা অর্জন করতে শিখেছেন, কিন্তু সাধারণভাবে নারীশিক্ষার জন্য আমরা এতদিনেও কিছুই প্রায় করতে পারিনি। তার প্রমাণ নাম স্বাক্ষর করতে পারেন এমন মহিলার সংখ্যা এদেশে এখনো ২৫% ভাগও হয়নি। এইসব কারণেই স্বাধীনতা লাভের এতদিন পরেও তাই এদেশের বিভিন্ন সাধারণ শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের সামান্যতম উন্নতি ঘটেনি বললে অত্যুক্তি হবে না মনে হয়। হরিজন-নিধন, নারী-নির্যাতন ও দরিদ্র শ্রেণীর লোককে শোষণের মাত্রা বরং আরো অনেক বেড়ে গেছে। তা না হলে নব্বই বছর আগে স্বামীজী যে নির্মম সত্যের উদ্‌ঘাটন করেছিলেন তা আজো এমন নিষ্ঠুরভাবে আমাদের বর্তমান ভারতবর্ষের সমাজে সমভাবে বর্তমান থাকে কী করে? স্বামীজী বলছেন, "নীচু জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে বসতে জুতো লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন পেশাদার ভিখিরি হয়েছে।" "যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল।" এর পরের উদ্ধৃতি

দুটি লক্ষ্য করলে মনে হবে এ যেন আজকের ভারতবর্ষেরই হুবহু চেহারা! মনে হবে এক ইঞ্চি অগ্রগতির পথে এখনো আমরা আসতে পারি নি। "দেখিবেন—আসুন···পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী···তথাকার সিকি ভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে।" পরবর্তী উদ্ধৃতিটি দেখুন, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে অতি সাম্প্রতিক কালের বিহার, উত্তরপ্রদেশ কিংবা তামিলনাড়ুর কোনো হরিজন-গ্রামের কথা। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের তামিলনাড়ুর একটি হরিজন-পল্লীর দরিদ্র অসহায় মানুষের উপর উচ্চবর্ণের ধনশালী মানুষদের নির্মম ভয়াবহ অত্যাচার-উৎপীড়ন-নির্যাতন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে কয়েকশত হরিজন নর-নারীর অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার মর্মন্তুদ করুণ কাহিনী। সেই যুগে স্বামীজী যা লিখে গেছেন—আজো তা সমান সত্য। "এই দেখ্ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পারিয়া কৃশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে।" যে যার আপন আপন ধর্মে স্থিত থেকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় যুক্ত থাকবে, মহৎ জীবন রচনায় ব্রতী হবে—, এবং মানুষ ক্রমেই মানসিকতার উজ্জ্বল প্রকর্ষে দেবতা হয়ে উঠবে—এই তো ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ। আমরা তো ধর্মান্তরণে বিশ্বাস করি না। আমাদের ধর্মের ইতিহাসে ও জিনিসটি নেই। এবং যে কোনো বিচারনিষ্ঠ যুক্তিশীল ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেই ধর্মান্তরণ কৃত্য একান্তভাবে পরিত্যাজ্য। কারণ ধর্মান্তরণ মানেই এক ধরণের নির্মম পাশবিক অত্যাচার—মানবতার চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও করুণ অপমান। অথচ আমাদের দেশে আজো তাই ঘটছে। অবিরাম ঘটছে। যদিচ ঘটার কথা ছিল না। বাধা দিতে পারছি না আমরা। দেশের সর্বত্র ঘরে বাইরে মানুষে মানুষে সমস্ত রকম মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের এই যে অবনতি ঘটছে, সমস্ত রকম মূল্যবোধের আজ যে এই নিদারুণ অবমূল্যায়ন এবং অবক্ষয়,—তার কারণ আমরা স্বামীজীর কোনো কথা তো শুনিইনি, তাঁর নির্দেশিত কোনো পন্থা অনুসরণ তো করিই নি, বরং তিনি যা নিষেধ করেছেন, যা করলে এ জাতির সর্বনাশ হবে বলে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা তার সেইসব নিষেধ

অমান্য করে এসেছি এতকাল ধরে। পরিণামে আমাদের চারিদিকে আজ এত অন্ধকার—ক্ষুধা—মৃত্যু—ষড়যন্ত্র—ধ্বংস—এবং সমূহ বিনষ্টির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সমগ্র জাতি। স্বামীজী বার বার বলে গেছেন ধর্মই হল ভারতের প্রাণ, ধর্ম লুপ্ত হলে ভারত মরে যাবে। আমরা ইউরোপীয় দল-সর্বস্ব সস্তা রাজনীতির চটুল মোহে সেই ধর্মকে পরিত্যাগ করেছি। সুস্পষ্ট প্রত্যয়ে তিনি সতর্ক করে দিয়ে গেছেন আমাদের, বলেছেন: "রাজনীতিক সামাজিক পরিবর্তন যতই হোক মানুষের দুঃখ-কষ্ট কিছুতেই দূর হবে না! কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করতে পারলেই সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট ঘুচবে। যতই শক্তি প্রয়োগ করো, যতই শাসন প্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি করা যাক—, কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষাই কেবল অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করে জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারে।"—এবং ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে একথা আরো অধিকতর সত্য। কারণ, স্বামীজীর ভাষায়: "আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা—আধ্যাত্মিক উন্নতি।" তাই তিনি ঘোষণা করলেন ত্যাগ ও সেবাই ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ। ঐ দুটি বিষয়ে যদি উন্নতি ঘটানো যায় তবে আর সব আপনিই হয়ে যাবে। এবং ভারতবর্ষের শাশ্বত জীবনপ্রত্যয়ই হল, স্বামীজীর ভাষায়: "পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতা ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ।" এই মহোত্তম মানবিকতা ও ধর্মবোধে যদি ভারতবর্ষ আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তবে কোনো ভয় নেই। আজকের এই অবক্ষয়ের অতল অন্ধকার থেকেও অবশ্যম্ভাবী তার মহাজাগরণ ও পুনরভ্যুত্থান। নবযুগরচনার দায়িত্ব অর্পণ করে ভারতকে তাই স্বামীজী অভয়বাণী শুনিয়ে বললেন: "ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তাহার যাহা দিবার আছে, দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।" পুনর্বার উচ্চারণ করলেন: "ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি আবার সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিবে। ...আমাদের যে শুধু স্বদেশকে জাগাইতে হইবে তাহা নহে। ...ভারতকে অবশ্যই

পৃথিবী জয় করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা নিম্নতর আদর্শে আমি কখনোই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। ...আমরা কি চিরকালই পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া সব জিনিস—এমন কি ধর্ম পর্যন্ত শিখিব? অবশ্য তাহাদের নিকট আমরা কলকব্জা শিখিতে পারি, আরও অন্যান্য অনেক বিষয় শিখিতে পারি, কিন্তু আমাদেরও তাহাদিগকে কিছু শিখাইতে হইবে; আমরা তাহাদিগকে আমাদের ধর্ম, আমাদের গভীর আধ্যাত্মিকতা শিখাইব।" শুধু তাই নয়,—ভারত যদি তার এই আধ্যাত্মিক চেতনায় সমুন্নত থেকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে আবার সে বিশ্ববিজয় করবে। তাই স্বামীজী ভারতের আরো অগ্রগতির কথা আমাদের শোনালেন: "চিরকাল শিষ্য থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। ...এখনও শত শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার জিনিস তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন তাহাই করিতে হইবে।"—"ইহাই আমার জীবন-স্বপ্ন—আর আমি ইচ্ছা করি তোমাদের মধ্যে—সকলের মনে এই প্রার্থনা জাগ্রত হউক।"—কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা ছেড়ে ভারতবর্ষ যদি রাজনীতিকে বা অন্য কিছু গ্রহণ করে—তাহলে তার সমূহ বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমরা পশ্চিম থেকে আমদানি-করা নীতিহীন রাজনীতিকেই জাতির সর্বরোগের একমাত্র বিশল্যকরণী বলে গ্রহণ করেছি। তার বিষময় ফল যা হবার তাই হয়েছে এবং হচ্ছে। অক্ষরে অক্ষরে নির্মমভাবে সত্য হতে চলেছে স্বামীজীর ভয়াবহ ভবিষ্যদ্‌বাণী। রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যা অথবা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে গেলে—সর্বনাশ হবে একথা বহুদিন আগে বারবার করে আমাদের শুনিয়ে গেছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির প্রয়োজনও তিনি অবশ্যই স্বীকার করেছেন। কিন্তু ঐগুলি গৌণ,—ধর্মই মুখ্য বলে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেদিকে আমরা ভ্রূক্ষেপও করিনি। বলে গেছেন তিনি: দরিদ্রের পর্ণকুটিরেই স্পন্দিত আমাদের জাতীয় জীবন। সেই দরিদ্র, নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলায় তাদের আমরা দূরে সরিয়ে রেখে তাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও সর্বনাশের অতলে নিক্ষেপ করেছি—। বার বার তিনি বলে গেছেন: "মানুষ চাই; আর সব হয়ে যাবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট,

তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক।" অথচ মনুষ্যত্বের সাধনায় আমরা চির-পরাঙ্মুখ। তাই আমাদের কোনো কিছুই হয়ে উঠছে না। ফুটা পাত্রে জল ঢালার মত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সব।

১৪

ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষার আদর্শ

প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে। তা হারিয়ে ফেললে জাতি আর বাঁচে না। আমরা আজ নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি—সেই জন্যই আজ আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট, এত অভাব-অনটন, চারিদিকে কত রোগ-মহামারী-মন্বন্তর। স্বামীজী বলে গেছেন: "ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবকে খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। আরো খাদ্য আরো সুযোগ প্রয়োজন।" একটাও করিনি আমরা। তাই ঘরে বাইরে আজ আমাদের চারিদিকে পরিত্রাণহীন এত সংকট। বার বার স্বামীজী বলে গেছেন সকল মানুষের সমান অধিকারের কথা। এবং সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে স্বামীজীর আজন্ম সংগ্রাম। আর স্বাধীনতার পর যে দলই যে রাজ্যে বা কেন্দ্রে সিংহাসনে বসেছে একমাত্র সুবিধাবাদেরই প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে সবাই। পরিণামে চারিদিকে আজ এত বিদ্রোহ, বিক্ষোভ এবং পরিপূর্ণ অরাজকতা ও নৈরাজ্যের প্রসার। স্বামীজী বলেছেন: "জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র। প্রতিটি ব্যক্তিকে যথার্থ শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলো—তারপর আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র আপনা থেকেই গড়ে উঠবে।" আগে চাই পরিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সবকিছু শুরু করেছেন উল্টো দিক থেকে। তাই অনন্ত বৃত্তপথে অবিরাম আমরা ঘুরে মরছি। শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতরের নিত্য-বিদ্যমান পূর্ণতার সম্যক প্রকাশ। "মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়া ভরিয়া রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করিয়া তোলা এবং উহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা—ইহাই হইল শিক্ষার আদর্শ।" স্বামীজী-কথিত শিক্ষার ও আদর্শের দিকে আমরা ফিরেও তাকাইনি। যাতে চরিত্র তৈরী হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মানুষ নিজের পায়ে

নিজে দাঁড়াতে পারে, স্বামীজী এইরকম শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ এযাবৎ মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক ও শিক্ষাদর্শের সন্ধানই করলেন না। এখান থেকে ওখান থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্য মাথায় ঢুকিয়ে দেয়ার যে শিক্ষা—যা শুধু মানুষকে কেরানী বা কারিগর-মিস্ত্রী বানাতে সাহায্য করে—সেই শিক্ষানীতিই আমরা সাগ্রহে মেনে নিলাম। পরিণামে যা হবার তাই হল। জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের একক পন্থা বলে স্বামীজী যে পথ-নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেদিকে আজো আমরা ফিরেও তাকাতে পারিনি। উচ্চবিত্ত সমাজের কিছু ছেলেমেয়েদের নিয়েই আমাদের যা কিছু শিক্ষার আয়োজন। যে দেশে ৩৫% মানুষ এখনো নাম স্বাক্ষর করতে পারে না—সে দেশের উচ্চশিক্ষার জন্যই সরকারের সমগ্র শিক্ষা-খাতের নির্দিষ্ট অর্থের বারো আনা খরচ হয়। এমন আশ্চর্য ব্যাপার এ দেশেই ঘটে। স্বামীজী অবশ্য স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরাজী আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-বিদ্যা পড়ানো হোক তাও চেয়েছিলেন। বেলুড়মঠের চত্বরে বেদান্ত মহাবিদ্যালয়ের পাশে পাশ্চাত্যের কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটি টেক্‌নিকাল স্কুল স্থাপনা করতেও তিনি সমানভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তিনি চেয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখতে; ধনী-নির্ধন, ইতর-ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ—সকল শ্রেণীর সব মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। আরো বলেছিলেন: কারিগরী শিক্ষা এদেশে অবশ্যই চাই; যাতে দেশে শিল্পোদ্যোগ বাড়ে এবং লোক চাকরী না করে দু'পয়সা করে খেতে পারে। তাঁর নিজের ভাষায়: "আমরা নির্বোধের মতো জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে চিৎকার করিতেছি।...বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।" সমাজের সাধারণ মানুষের কথা ভেবে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এসব চিন্তা-ভাবনা যে কতটা প্রাগ্রসর জীবন-দৃষ্টির প্রকাশ, গেরুয়া কাপড় পরিহিত বলে যাঁরা স্বামীজীকে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলেন একবার তাঁদের ভেবে দেখতে বলি। অবশ্য অতি সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েট রাশিয়ার ডঃ ই. পি. চেলিসেভ, চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াং চিং হুয়াং প্রভৃতি কমিউনিষ্ট দেশগুলির গবেষকগণ কর্তৃক তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে এবং প্রবন্ধাবলীতে

স্বামীজকে প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারক এবং শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদেরও আদর্শস্বরূপ-রূপে বর্ণিত হবার পর দুর্দান্ত সব প্রগতিবাদী—সমাজতন্ত্রী ও আর স্বামীজীকে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলতে সাহস করছেন না। যাই হোক, আমাদের এই কৃষি-প্রধান দেশে তিনি কৃষির দিকে সমান নজর দিতেও বলেছিলেন। স্বাধীনতার পর থেকেই অবশ্য এই দুটি দিকে কৃষি ও শিল্পোদ্যোগে আমরা যত্ন নিয়েছিলাম বলে এই দুটি বিষয়ে আমাদের অনেকটাই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন ছাড়া কৃষিবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা শিখিয়ে শুধু চাষা ও মিস্ত্রী-কারিগর বানালে কোনো কোনো ব্যক্তির কিছু সুখ-সুবিধেও লাভ হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতে দেশের কোনো কল্যাণই সম্পন্ন হবে না। অনেক জলই যে ফুটো পাত্র থেকে বেরিয়ে যায় এ সত্য আমরা স্বীকার করিনি। এবং তার বিষময় ফল আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ভোগ করছি। unassimilated, undigested and unharmonised অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে সংস্রবহীন এখান থেকে ওখান থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহের নাম শিক্ষা নয়, বিদ্যা নয়। এতে করে উপাধি অর্জিত হতে পারে, ভালো কর্মসংস্থানও কিছু লোকের হতে পারে, কিন্তু এই শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র দেশের সার্বিক কল্যাণ ও সমুন্নতি সম্পাদিত হতে পারে না। এবং সমাজজীবনেরও কোনো সার্বিক অগ্রগতি বা আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয় না। হয় না যে তা স্বাধীনতা লাভের আটত্রিশ বছর পরেও আমরা সকলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। শ্রদ্ধাহীন, চরিত্রহীন শুধুমাত্র 'Storehouse of undigested information' হয়ে কিছু লোক রুজি-রোজগারের উপযোগী হলেও সামগ্রিকভাবে দেশের কোনো লাভ হয় না। বরং ক্ষতি হয়। আদর্শভ্রষ্ট, চরিত্রহীন কতগুলি অমানুষ তৈরী হয়।

১৫

স্বামীজীর আদর্শ রাষ্ট্র-পরিকল্পনা, শুদ্ধ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং সেবা-প্রকল্প

সাম্য ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্তনা দ্বারাই সকল মানুষকে সমান স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা দান এবং সকল মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণসাধন সম্ভব—এরকম একটা

বিশ্বাস আজকাল অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। এমনকি স্বয়ং স্বামীজীও ক্ষুধার্ত দুঃস্থ দুঃখী সাধারণ মানুষের, জনসাধারণের অপরিসীম দুর্দশা-লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী বলে (Socialist) ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি ঐ মতবাদকে নির্ভুল বলে মনে করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।"—এই হিসেবেই তিনি সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এতে করে যদি গুরু-কথিত ইতর-সাধারণের খালি পেটের সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়, অবশ্যই নতুন মতবাদকে প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। মানব-সৃষ্ট কোনো প্রথাই ত্রুটি-বিচ্যুতি-নির্মুক্ত হতে পারে না। এ যাবৎ প্রচলিত সকল প্রথারই নানারকম গলদ ধরা পড়েছে। তাহলেও নতুনত্বের দিক থেকে সমাজের বৃহত্তর অংশ ভুখা জনগণের কথা স্মরণ করে এই পদ্ধতিরও একবার সম্প্রয়োগ ঘটিয়ে দেখা যেতে পারে—ক্ষতি কি? এবং বিশ্ব-ইতিহাস পর্যালোচনা করে একথাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—বিশ্বব্যাপী শ্রমিক ও শূদ্র-রাজত্বের (Dictatorship of the proletariate) প্রতিষ্ঠাও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রত্যাসন্ন সেই শূদ্র-রাজত্বের সুনিশ্চিত দোষত্রুটিগুলিও সব জানতেন তিনি। তথাপি "বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়" আত্মোৎসর্গই যাঁর জীবনাদর্শ, আচণ্ডালে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অধিকার দানই যাঁর কাম্য, তিনি সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও হৃষ্ট চিত্তে স্বাগত জানিয়ে গেছেন আসন্ন শূদ্র-রাজত্বকে। কারণ সেই একই—: "নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।" শূদ্র-রাজত্বকে তিনি কখনোই আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি বলে মনে করতেন না।—তিনি চাইতেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার যুগের যা কিছু ভালো তাই দিয়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ রাষ্ট্র রচনা করতে : যেখানে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দেয়া হবে সবচেয়ে বেশী, যেখানে থাকবে সকলের সমান অধিকার, প্রতিটি ব্যক্তির অবিরাম হয়ে ওঠার সাধনা যেখানে থাকবে অক্ষুণ্ণ, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের থাকবে প্রীতি ও প্রেমের মধুর সম্পর্ক, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের, ব্যক্তি ও সমাজের এবং দেশের সমাজের ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক হবে সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক এবং পরস্পরের পরিপূরক। এবং সবচেয়ে বড় কথা সে রাষ্ট্রে বিশেষ অধিকার ভোগ করতে পারবে না কেউ। বস্তুত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের

যেখানে যা কিছু ভালো ও লোক-কল্যাণকর, এবং যেখানে যা কিছু পরিণামে শ্রেয়, তাই দিয়ে রচনা করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী তাঁর সোনার ভারতবর্ষ—। তাই তিনি খুব সহজেই বলতে পেরেছেন : "চাই western science-এর সঙ্গে বেদান্ত, আর মূল মন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।" ঘোষণা করতে পেরেছেন : "তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্মবিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু (ভারতীয়) হইতে পারো ? ইহাই করিতে হইবে। এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখো।" বলছেন : "আমাদের চাই স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী ও বিজ্ঞান পডানো, চাই কারিগরি শিক্ষা—চাই যাতে শিল্প বাড়ে ; লোকে চাকবি না করে দু' পয়সা ক'রে খেতে পারে।" কারণ তিনি জানতেন : "ধর্মকথা শোনাতে হ'লে আগে এ দেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোনো ফল হবে না।" জানতেন—দরিদ্রের পর্ণ কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন—স্পন্দিত। জানতেন মেয়েদেব আগে তুলতে হবে। Mass-কে জাগাতে হবে ; তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ। জানতেন শিক্ষা, শিক্ষাই সর্ব রোগের একমাত্র মহৌষধ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানতেন যে, ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। এবং আরো জানতেন, "যদি এ দেশের সভ্যতা বা অন্য কোনো সভ্যতা ধর্মের উপর, মানবের সাধুতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা টিকতে পারে না।" আরো স্পষ্ট করে জানালেন : "একমাত্র অধ্যাত্ম-জ্ঞানই আমাদের সমুদয় দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করতে পারে ; অন্যান্য জ্ঞান অতি অল্প সময়ের জন্য অভাব পূরণ করে মাত্র।" "আমাদের কার্যের এই মূল কথাটা সর্বদা মনে রাখিবে ;—ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতি সাধন।" জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ঠাকুর-স্বামীজীর এই মৌল দৃষ্টিভঙ্গীটি অবশ্যই আমাদের স্মর্তব্য। ঠাকুরের সেই অসাধারণ উক্তিটি মনে পড়ে "বেলের সার বলতে শাঁসই বুঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই

লীলা। তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দিই না। তাহলে যে ওজনে কম পড়বে।" লীলা যে কেবলমাত্র নেন, শুধু তাই নয়। বস্তুত: সমাজতন্ত্রের অর্থ যদি হয় বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় আত্মোৎসর্গের শর্তহীন শপথ, সমাজতন্ত্রের অর্থ যদি হয় ব্যক্তি হৃদয়কে বিশ্বের জন্য প্রসারিত করে দেবার মহোত্তম সাধনা,—সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ যদি হয়—কায়েন-মনসা-বাচা—সকল মানুষের জন্য অবিরাম কুশল কর্মের শ্রদ্ধিত অনুষ্ঠান, তাহলে প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রের কোনো তুলনা নেই, এবং তাহলে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকেও অবশ্যই একজন শ্রেষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক রূপে চিহ্নিত করতে হয়। ঠাকুরের সমগ্র জীবনচর্যাই আমাদের এই উক্তির স্বপক্ষে উদ্ধৃত করা যায়। আর শিষ্য তো ঘোষণাই করে দিলেন: "আমাদের মিশন হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভুষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকর জন্য।" আর্তের সেবায় সর্বস্ব, এমনকি আত্মত্যাগ পর্যন্ত—শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম, একথা ঘোষণা করেও গুরু শিষ্য উভয়েই কিন্তু মনে করতেন, চেতনার অমল উর্ধ্বায়ন ছাড়া, ব্যক্তি-হৃদয়ে শুদ্ধ মানবতার উদ্বোধন ব্যতিরেকে যথার্থ মানবকল্যাণ সম্ভব নয়, এবং কোনো 'ইজম্' বা মতবাদই সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে না। যতই পূর্ণ করা হোক, মনুষ্যত্বহীনতার ফুটো পাত্র দিয়ে পাত্রের সব জল অজ্ঞাতে নিঃশেষ হয়ে যায়। যেহেতু ব্যক্তি নিয়েই সমষ্টি, তাই সবচেয়ে আগে দরকার ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি ও চেতনার সংস্কার। পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিত্ব ও শুদ্ধ চরিত্র-সম্পন্ন, হৃদয়বান মানব-গোষ্ঠীই সবরকম রাষ্ট্রীয় এবং বিশ্বকল্যাণের একক প্রতিশ্রুতি। তাই দেশের মানুষকে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠবার অধিকার দান সবচেয়ে আগে প্রয়োজন বলে স্বামীজী উপলব্ধি করেছেন। এবং সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারলেই, অন্ততঃ শুদ্ধ মনুষ্যত্বের সাধনায় যুক্ত থাকলেই, একমাত্র বেদান্ত-জ্ঞান অর্জনের পথ নির্মুক্ত রাখা যায়। আর তখনই জীবনদর্শন হিসাবে আমাদের বিশ্বৈক্যবোধ বা সর্বাস্তিবাদের ধারণা করা সম্ভব হয়। অন্য কোনো সহজ পথে, 'সর্ট-কাট' বা 'মেড ইজি'র সাহায্যে কিংবা মনুষ্যত্বহীন অন্য কোনো মতবাদের সম্প্রয়োগে ও বিস্তারে মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে বিশ্বমানবতার প্রাঙ্গণে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এবং বিশ্বৈক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সমগ্র মানব-

গোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণকৃত্যও সম্ভব নয়। পূর্বোক্ত ধর্ম বা অধ্যাত্ম-চেতনা বলতে গুরু শিষ্য উভয়েই পথ নির্দেশ করেছেন ভারতীয় সর্বাস্তিবাদের মহান দর্শনেব অভিমুখে। সংক্ষেপে যাকে জীব-শিব তত্ত্বরূপেও ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে:—তা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির পরিত্রাণ নেই। সকলের মধ্যে সেই অদ্বয় "এক"-এর অধিবাসনা প্রত্যক্ষ করার সাধনা গ্রহণ করা। নিজের অন্তরেব সুচেতনাকেই সর্বত্র প্রসারিত করে দেওয়া। কাজটা খুব সহজ নয়। অথচ এছাড়া বিশ্বমানবের মুক্তির দ্বিতীয় আর কোনো পন্থাও নেই। তাই সর্বসাধারণের জন্য রচনা করলেন সেবা-প্রকল্প। জগৎ ও জীবনের সবত্র সকলকে নিজের মতো করে সমদৃষ্টিতে দেখতে না পাবলে কোনোভাবেই মানবকল্যাণ করা সম্ভব নয়,—সম্ভব হয় না মানুষের দুঃখ মোচন করা বা বন্ধন-মুক্তি ঘটানো। অন্ততঃ সমদৃষ্টিতে দেখার সাধনায় যুক্ত থাকতে হবে সেবা-ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে।

এই সেবা-প্রকল্প বা সেবা-পূজার শুদ্ধ আদর্শ, প্রয়োগরীতি এবং পরিমাণে ব্যক্তি ও সমষ্টি-মানুষের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমুন্নতির কথা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন স্বামী প্রভানন্দ: "ঠাকুর বৈষ্ণবভাব 'জীবে দয়া' সমর্থন করতেন না। কারণ দয়া শব্দটির উৎপত্তি দয়্ ধাতু থেকে। এর মানে অনুগ্রহ করা। শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন শিবজ্ঞানে নারায়ণ-জ্ঞানে আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবা করা। শ্রদ্ধা ও প্রীতি মেশানো সেবা তিনি নিজের জীবনে বার বার আচরণ করে এই ভাবাদর্শটির তাৎপর্য প্রদর্শন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ একেই বলেছেন সেবা-পূজা। এই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতে দীর্ঘকাল চাপা পড়ে ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই তত্ত্বকেই পুনরুদ্ধার করে যুগ প্রয়োজনে প্রয়োগ করলেন। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মজ্ঞ কপিল জননী দেবহুতিকে বলছেন: অর্থ যং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্হয়েৎ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা। ভূতে ভূতে সর্বভূতে বিরাজমান একই নারায়ণ। এই তত্ত্ব জেনে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে অবস্থিত নারায়ণকে পূজা করতে হবে। পূজা করতে হবে চারটি উপকরণ দিয়ে। প্রথম উপকরণ হচ্ছে দান, যেমন অন্নদান, বিদ্যাদান ও জ্ঞানদান। দ্বিতীয় হচ্ছে মান, তৃতীয় মৈত্রী এবং চতুর্থ ও শ্রেষ্ঠ উপকরণ অভিন্ন দৃষ্টি। এই ভাবটি আশ্রয় করে সেবা-পূজা করতে পারলে সমাজের

দুর্বল অংশ বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে। মানুষে মানুষে যথার্থ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারবে।

এবং সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের বিচারে কোনো রক্তক্ষয়ী বিপ্লব না করেও ভোগাধিকারের পূর্ণ সাম্য স্থাপন করা সম্ভব হবে। শোষণহীন যথার্থ কল্যাণপ্রসূ এক মহৎ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

১৬

মানবকল্যাণ, সমাজতন্ত্র এবং ভারতদর্শনের সর্বাস্তিবাদ ও ভারতীয় আদর্শ

আজকাল গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও সাম্যের কথা অনেকে বললেও—একজন মানুষ কেন আর একজন মানুষের সমান—তা কিন্তু যুক্তি দিয়ে কেউই প্রমাণ করতে পারবে না। মানবকল্যাণ ও দুঃখী-দুর্গতদের মুক্তির কথা যুগে যুগেই প্রায় সব দেশে উচ্চারিত হয়েছে—এবং ইউরোপ আমেরিকায়ও বহু ভাবে মানবকল্যাণ-কৃত্য সম্পাদিত হয়েছে এবং হচ্ছে এখনও। কিন্তু কেন মানুষের কল্যাণ করব, কেন তৎপর হব দুঃখীর-দুঃখ মোচনে, আর্তের সেবায়—সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের কোথাও এর সদুত্তর নেই। প্রতিবেশীকে ভালোবাসার উপদেশ খ্রীষ্টধর্মে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন অন্যকে ভালোবাসব, সেবা করব, কেনই বা অপরের উপকারে, কুশলকর্মে ব্রতী হব—এর দুটি উত্তর ওঁদের পাশ্চাত্য দার্শনিকদের জানা আছে। এক ঃ আমার ভালো লাগে বলে এইসব কুশল কর্ম আমি করব এবং দুই ঃ কেননা এভাবে অন্যের উপকার করলে, অন্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'লে আমার নিজেরও মঙ্গল হবে, উপকার হবে, ভালো হবে। প্রথমতঃ নিছক ভালো লাগার পথ ধরে কোনো সমাজেই বেশীদূর এগোনো যায় না। মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের পরিপ্রেক্ষায় এই ভালো লাগার থিওরি অচল। কেননা কোনো সমাজই আমার যথেচ্ছ ভালো লাগাকে প্রশ্রয় দেবে না। তাছাড়া ভালো লাগা ব্যাপারটাই বড় ক্ষণিকের ও একান্তভাবে পরিবর্তনশীল এবং গোলমেলে। ধরা যাক, আজ আমার দরিদ্রকে সেবা করতে ভালো

লাগছে! কাল হয়ত অপরকে প্রহার বা অকারণে পীড়ন করতে বা খুন করতেও ভালো লাগতে পারে! কিন্তু ভালো লাগলেই তো সব কিছু করা যায় না। আর দ্বিতীয়তঃ নিজের ভালো, নিজের উপকার বা আত্মসুখ— সে তো নানা অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথেও অর্জিত হতে পারে। সে জন্য তো জন-সেবার, সমাজকল্যাণ-কৃত্য, লোকহিতের কর্ম সম্পাদনার প্রয়োজন নেই। এবং এদেশে ওদেশে রাজনীতির দাদারা সমাজ-সেবা, দেশের কল্যাণ ও মানব-প্রীতির ছদ্ম ভূমিকায় নিজের ভালো, নিজের উপকার বা আত্মসুখ কীভাবে, কোন্ গোপন পথে অবিরাম সংগ্রহ করে চলেছেন তার ইতিহাস এখানে উন্মোচিত করতে চাই না। আমাদের সকলেরই সেই অন্ধকার ইতিবৃত্তের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় রয়েছে, বস্তুতঃ এখানেই ইউরোপীয় লোভলোলুপ—পাশবিক সমাজতন্ত্রবাদ বা তথাকথিত সাম্যবাদের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদের মৌল পার্থক্য। বলা বাহুল্য, আমাদের ভারতদর্শনের বিশ্বৈক্যবোধ বা সর্বাস্তিবাদকেই আমি ভারতীয় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি বলে আখ্যা দিতে চাই। এই সমাজতন্ত্রবাদ দল-মত-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের সমানভাবে হয়ে ওঠার অধিকারে আস্থাশীল। এখানে সকলেই সমানভাবে স্বাগত। ইতর-ব্রাত্য-আর্ত-দুঃখী-দরিদ্র-পতিত চণ্ডালের সঙ্গে আমরা অনায়াসে বলতে পারি, "এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার।" কারণ "সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীর" ছাড়া মায়ের অভিষেকের মঙ্গলঘট যে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। কারণ, সর্বত্র সেই 'এক'-কে দেখতে পারলে, নিজের ক্ষুদ্র অহম্-কে সর্বত্র, সকলের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে পারলে তখন তো আর কেউ আমার শত্রু থাকতে পারে না। কাকে মারব—কাকে আঘাত করব—? কার জিনিস চুরি করব? প্রতারণাই বা করবো কাকে—? ঘুষ খাবো কার কাছ থেকে? সর্বত্রই তো নানারূপে আমিই ছড়িয়ে আছি। এই বোধে স্থিত হলে অন্য সকলকে ভালোবাসা মানে নিজেকেই ভালোবাসা। অন্য কোনো মানুষকে সেবা করার অর্থ আত্মসেবা বা ব্রহ্মসেবা। শ্রেণী-সংগ্রামের নামে এই যে মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করা, মানুষে বিভেদ রচনা করা, মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়া—কিংবা মানুষের ভিতরের পশুশক্তিকে উত্তেজিত করে পরস্পর দু'দলকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত করবার উদ্যোগ: এই ভয়াবহ সমাজতন্ত্রে

আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। একদল মানুষকে মেরে কেটে, খুন করে, তাদের যথাসর্বস্ব লুটপাট করে কেড়ে নিয়ে, অথবা তাদের সবকিছু ধ্বংস করে, আর একদলকে সিংহাসনে বসাবার হিংস্র আরণ্যক পাশব পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষ কোনোদিন কোথাও করেনি এবং করবেও না। সাময়িক যত অধঃপতনই আজ চারিদিকে প্রকট হয়ে উঠুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে তার আপন জীবন-প্রত্যয়ে স্থির হবে এবং খুঁজে পাবে তার সত্যিকার স্বধর্ম। আন্দোলন, শ্রেণী-সংগ্রাম, বিপ্লব-বিদ্রোহ প্রভৃতি মুখরোচক সব নামে মানুষের ভিতরের নখর-দংষ্ট্রা মুখর নোংরা পশুটাকে ইচ্ছা করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়ে—তারপর সেই উন্মাদ পশুশক্তির সাহায্যে নীতিহীন রাজনীতির আড়ালে আত্মগোপন করে যেন-তেন-প্রকারেণ রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা দখল করা ও দেশের উৎপাদন যন্ত্র করায়ত্ত করাকেই আমরা কখনোই সমাজতন্ত্র বা সাম্যের পরাকাষ্ঠা বলে মেনে নিতে পারিনি। নিছক গায়ের জোরে বা বন্দুকের নলের সাহায্যে সকলকে নীচে নামিয়ে এনে তারপর যথেচ্ছ স্টীমরোলার চালিয়ে সকলকে সমান করে দেবার সাম্যে বিশ্বাস করি না। তাছাড়া আমরা মনে করি ভিতরের মানসিক পবিবর্তন ও চিত্ত-চেতনার সমুন্নতি ও ঊর্ধ্বায়নার মধ্য দিয়ে শুদ্ধ মানবিকতায় উত্তীর্ণ ও স্থিত মানবসমাজের প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোনো ইজম্-ই সার্থক হতে পারে না। অবনমন কোনো কারণেই কোনো অবস্থায়ই আমাদের আদর্শ নয়। সর্বাত্মকভাবে সকলের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নই আমাদের অন্বিষ্ট। আমাদের শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস-দর্শন, ধর্ম-বিজ্ঞান—সর্বত্রই এর অজস্র সাক্ষ্য বিদ্যমান। কোনোদিনই খুনের রাজনীতিতে আমাদের আস্থা নেই।

আমাদের "স্বাধীনতা" কথার অর্থ পাশ্চাত্যের 'Independence' নয়। আরো গভীর তার অর্থদ্যোতনা। শেষ পর্যন্ত মানবাত্মার সর্বাত্মক বন্ধন-বিমোচনের অমল অঙ্গীকারে দায়বদ্ধ আমাদের এই স্বাধীনতার দিব্য আদর্শ। এবং এই স্বাধীনতারই অপর নাম স্বরাজ বা স্বারাজ্য লাভ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নির্দেশিত স্বাধীনতার পথ অন্বিষ্ট সেই আদর্শের অভিমুখেই নিত্য অভিযাত্রী। তৈত্তিরীয় উপনিষদের—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনস্পতিম্।"—প্রভৃতি মন্ত্রে মানুষের সর্বাত্মক ও সার্বিক মুক্তির—

সেই আদর্শ স্বারাজ্যের কথাই বিঘোষিত। তৈত্তিরীয়োপনিষদ প্রথম অধ্যায়/ ষষ্ঠ অনুবাক/দ্বিতীয় মন্ত্রগুচ্ছ।

পরবর্তীকালে জন্মগত জাতিভেদে রূপান্তরিত হলেও মূলতঃ ব্রাহ্মণত্ব মানব জীবনের একটি বিশেষ গুণগত উচ্চ অবস্থা। এবং এ অবস্থা সকলের পক্ষেই সাধনার দ্বারা লভ্য। স্বামীজী তাই বলছেন, "আমাদের সমাজবাদের আদর্শ সমস্ত মানুষকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা। তাই গায়ের জোরে সকল মানুষকে সমাজের উচ্চ মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে সবাইকে একসঙ্গে সত্যিকারের শূদ্র বানিয়ে—কেবলমাত্র আহাব-নিদ্রা-মৈথুন প্রভৃতি জৈবিক জীবনের শরিক করে, মানবাত্মার সবরকম উর্ধ্বায়নের পথ বন্ধ করে—অক্ষম জীবতার অতল অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ও নিমজ্জিত করার ইওরোপীয় রক্তস্নাত আগ্রাসী সাম্যবাদ আমাদের নয়। আমাদের সাধনা শূদ্রত্বের নয়; ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্বই আমাদের প্রার্থিত। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নাগরিককে ব্রাহ্মণত্বের উচ্চাবস্থায় সমুত্তীর্ণ করাই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের একক অন্বিষ্ট। কাউকে বাদ দিয়ে—কাউকে পরিত্যাগ করে নয়, হিংসার লোভের পথে, হানাহানি-ষড়যন্ত্র-রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নয়, প্রীতি ও প্রেমের অমল অনুশাসনে সকলকে গ্রহণ করে—সবাইকে নিয়ে একই সঙ্গে সর্ববন্ধন-মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণের পথে নিত্য অভিযাত্রী ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের মহান সমাজতন্ত্রবাদ। এই কারণেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র যথার্থই বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদ কার্ল মার্কসের বই থেকে জন্ম লাভ করেনি। বিধানসভায় বা লোকসভায় সত্যমিথ্যা মিলিয়ে গরম গরম কিছু ভালো ভালো কথা বলা, আর নিজেদের দল বা গোষ্ঠীতে লোক ভাঙিয়ে নিয়ে আসা— ; আর তাতে ব্যর্থ হলে পবিত্র বিপ্লবের নামে নির্বিচারে বিপক্ষ দলকে নিঃশেষে খতম করে দেয়া! —হয়ে গেল ইওরোপীয় সমাজতন্ত্রের চরম পরাকাষ্ঠা? প্রত্যহ জীবনচর্যার সঙ্গে, মনুষ্যত্বের সঙ্গে এদের রাজনীতির কোনো যোগ নেই। ওদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন বা জনজীবন সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বিপরীত মুখে প্রবাহিত। ব্যক্তিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করাও তাই ইউরোপীয় ভব্যতায় বাধে। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে যে সবই গরমিল, সবটাই গণ্ডগোল। কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্র ছিল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

প্রসারিত, সমাজ-জীবনের প্রতিটি বিষয়ে প্রযুক্ত। আমাদের প্রত্যহ-দিনচর্যায়, প্রতিটি মুহূর্তের কর্মে ও কথায়—, এমনকি প্রত্যেক নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে আমাদের অবশ্য কৃত্য ছিল সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তা। ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন ও তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ জনজীবন একই বিন্দুতে মিলে যেত। ব্যক্তিজীবনে চূড়ান্ত ত্যাগ ও তিতিক্ষা ছাড়া, দেশ ও সমাজেব কাছে আত্মনিবেদন ব্যতিরেকে, মানুষের জন্য অপরিসীম অনুভব ছাডা, যথার্থ সাম্যবাদী হওয়া, সত্যিকারের সমাজবাদী গণনেতা হওয়া, সম্ভব ছিল না। স্বামীজীর ভাষায়, "শিরদার তো সরদার, মাথা দিতে পারো তো নেতা হবে।" প্রতিটি মুহূর্তে মানব-কল্যাণে, পরোপকারের প্রতিশ্রুতিতে আত্মনিবেদিত হতে হবে। অতিথি আমাদের কাছে দেবতা। পিতা-মাতার মত অবশ্য বন্দনীয়। প্রত্যেকটি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মানুষের প্রতিটি কাজ তাঁরই কাজ। তাই প্রাচীন ভাবতে প্রতিটি যৌথ পরিবারই ছিল যেন এক একটি কমিউন। সমগ্র পরিবারের সমস্ত কর্মসূচি একটি মহৎ মানবিক ঐকতানে বিধৃত থাকত। কারণ আমাদের সমাজ সেই মহামায়ারই ছায়ামাত্র। কারণ স্বামীজীর ভাষায়ঃ আমাদের বিবাহ, আমাদের ধন, আমাদের জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখেব জন্য নয়। আমরা ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারবো না যে আমরা ভারতবাসীরা সকলেই "জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।" আমাদের ইতিবৃত্তের দিকে তাকিয়ে দেখেছি "মূর্খ ভারতবাসী" দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী" সকলেই আমাদের ভাই। শাশ্বত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। এই আমাদের জীবনাদর্শ।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

কবে কোথায় লোক-জীবনের কোন্ গভীর উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছিল এই শ্লোকটি, মহোত্তম এই জীবন-বাণী—কেউ তা জানে না। কোন্ কবি, কোন্ দার্শনিক, না কি অতি সাধারণ কোনো মানুষ—কে এর রচয়িতা জানা নেই তা আমাদের। কিন্তু আসমুদ্রহিমাচল সর্বত্র এই শ্লোকটি উচ্চারণ করি আমরা—পরম শ্রদ্ধায় ও আনুগত্যে, অনূদিত করতে প্রয়াসী হই, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এবং জীবনে জীবন যোগ করার ব্রতে অনুপ্রাণিত

হই আমরা আজো। এই আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়,—তবে বিপন্নও নয়, আরো এক অনুভূত উজ্জ্বল বিস্ময় রয়ে গেছে আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে, আশ্চর্য এই দেহের দেবায়তনের অন্তরালে। এই 'আমাদের সমাজ যে মহামায়ারই ছায়া মাত্র' এ শুধু কথার কথা নয়—একথা আমরা বিশ্বাস করি সমগ্র আমাদের মানব সত্তা দিয়ে। এবং বস্তুতঃপক্ষে আমাদের মা এই সমাজ, এই দেশ, এই পৃথিবী। এবং বিশ্ব-পৃথিবীর সকল মানব-মানবী আমাদের ভাই-বোন। সর্বাস্তিবাদের অমোঘ বিশ্বাসে স্থিত হয়েই আমাদেব মহাকাব্য তাই অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন—পরোপকারের জন্য আত্মোৎসর্গই জীবনের শ্রেষ্ঠ মানবকৃত্য। আমাদের উপনিষদ্ বলছেন: "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা / সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" উপনিষদ—আরো বলছেন: "এক দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ / সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। / কর্মাধ্যক্ষ সর্বভূতাধিবাসঃ"—ইত্যাদি। আমাদের শাস্ত্র ঘোষণা করেছেন: "একস্তথা সর্বতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপ বহিশ্চ।" মানবকল্যাণের, নরনারায়ণ-সেবার নানা কর্মে প্রবর্তনার জন্য উৎসাহ দিয়ে, অভয় দিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলছেন: "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" মানবকল্যাণের কর্মে যিনি যুক্ত, সেবাধর্মে যিনি নিত্য কোজাগর, তাঁর কখনো দুর্গতি হয় না—হতে পারে না। "নিঃশেষে প্রাণ যে করিল দান—ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।" আবার পরোপকার (Social service) ও মানবসেবা করতে গিয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, ক্ষুদ্র মানুষ আমরা—শুদ্ধ বিনম্র সেবকের ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে দম্ভ-অহমিকা স্বার্থপরতা ও লোভ এসে যাতে আমাদের গ্রাস না করতে পারে, তার জন্য বার বার আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন নানা শাস্ত্রের মাধ্যমে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিমুনিগণ। গীতা বলছেন: "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" প্রত্যহ উষালগ্নে প্রথম ঘুম থেকে উঠেই আমরা প্রার্থনা জানাই আমাদের জীবনের অধিদেবতার কাছে:—আমি যেন সত্য থেকে—ধর্ম থেকে—মানুষের জন্য কল্যাণ ও কুশলকর্মের সম্পাদনা থেকে কখনো ভ্রষ্ট না হই। "সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন-প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্।" প্রাচীন ভারতবর্ষ উপদেশ দিয়েছেন নিত্য এবং লীলা দুইই মেনে নিতে। তাই জীবনধারণের জৈবিক প্রয়োজনে

একদিকে তাঁরা যেমন প্রজা-পশুর বৃদ্ধির প্রার্থনা নিবেদন করতেন ঈশ্বরের কাছে, তেমনি আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ, স্তূপীকৃত বস্তুসঞ্চয়ের প্রবণতার বিরুদ্ধেও সমভাবে সজাগ থেকে ধিক্কার উচ্চারণ করতেন। লোভী, স্বার্থপর, আত্মসুখপরায়ণ অর্থসঞ্চয়কারীদের সামাজিক একঘরে করার নির্দেশও দিয়ে গেছেন সমাজ ও শাস্ত্র। অথচ আমাদের প্রার্থনা ছিল এও: সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার কথায় চিন্তায় কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়। কারো দুঃখপ্রাপ্তির কারণ যেন আমি না হই। আমার চিন্তা-কথা-কাজ, সমগ্র আমার "জীবন-যৌবন-ধন-মান" সবই যেন অপরের আনন্দদানে নিবেদিত হয়। "সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।" সকল মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি—এই আমাদের একমাত্র কাম্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "নয়ন দু'টি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুশী। যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি'।"—ভারতীয় জনজীবনের এই ছিল অন্বিষ্ট আদর্শ। এমন কি সকল মানুষের সর্বাত্মক সর্বমঙ্গলবিধায়ক, বিশ্বের সকলের আর্তিহরণকারীরূপে—শান্তিরূপে—আনন্দরূপে বিরাজমান—আমরা সেই দেবতারই বন্দনা-গান রচনা করি। "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত অতৃপ্ত আত্মা রয়েছেন—আপনারা সকলে আমার অন্তিম অঞ্জলি গ্রহণ করুন"—এই হল আমাদের পিতৃ-তর্পণের শেষ মন্ত্র। আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে লোকধর্মও বলছে:

> ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং না পুনর্ভবং।
> কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

দুঃখ-তাপ-দগ্ধ প্রাণীদের আর্তিনাশ করাই আমরা জীবনের পরম ব্রতরূপে একদা গ্রহণ করেছিলাম। জাতি-ধর্ম-উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঈশ্বরেরই রূপ ভেবে সেবা করা এবং সকল মানুষকে নিজের একান্ত প্রিয়জনের মতো ভালোবাসাই এদেশের শ্রেষ্ঠতম ধর্মরূপে চিরকাল প্রকীর্তিত। এমন কি একটি বৃক্ষকে ছেদন করতে হলে পর্যন্ত আমরা আগে তাকে প্রণতি জানিয়ে, মার্জনা ভিক্ষা করে নিতাম। আমার প্রাত্যহিক জীবন-ধর্মের সম্পাদনার প্রয়োজনে তোমাকে ছেদন করে বিনষ্ট করতে হচ্ছে, হে বৃক্ষ! তুমি আমাকে মার্জনা করো। মাটি আমাদের প্রাণ-ধারণের জন্য ফলে ফসলে প্রতি মুহূর্তে উপহার সাজিয়ে রাখে, দিনযাপনের অজস্র

উপকরণ দান করছে আমাদের। তাই মাটি আমাদের মা। এবং আমাদের যা কোনো কাজে লাগে না, সেই ঘাসপাতা, খড়, তরকারির খোসা এবং সকলের পরিত্যক্ত মূল্যহীন খাদ্যাবশিষ্ট মাত্র গ্রহণ করে গরু আমাদের দুধ দেয়, চাষে ও পথ চলায় সহায়তা করে, এবং প্রাণধারণের নানা উপকরণ, নানা দ্রব্য দান করে সমৃদ্ধ করে রেখেছে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ। তাই গো-মাতা। আমার ঘরের প্রাত্যহিক নানা কাজে আমাকে যে মেয়েটি রোজ সাহায্য করে, ঘর ঝাঁট দেয়, ঘর-দুয়ার মোছে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে—তাকে বলি আমরা 'ঝি'; মানে সেও আমাদের পরিবারের একজন, আমার কন্যাস্থানীয়া। সকলকে এভাবে আপন করে নেবার শিক্ষাই আমাদের পরিবার-কেন্দ্রিক সভ্যতা ও সমাজতন্ত্রবাদের শিক্ষা। এবং বলেছি, শাস্ত্র আমাদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে অর্থ সঞ্চয় করবে সে শূকর-যোনি প্রাপ্ত হবে। অকারণ অর্থ সঞ্চয় এবং স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য সম্ভার সংগ্রহ করাকে অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে। দেবকার্যে এবং মানবহিতে ব্যয় করাই অর্থের ও ঐশ্বর্যের একমাত্র সার্থকতা। বেদ-উপনিষদ থেকে শুরু করে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবী পর্যন্ত সকলেই স্তূপীকৃত অর্থ সঞ্চয়ের সম্মোহকে ক্ষমাহীন সামাজিক পাপ বলে নির্মম ভাষায় ধিক্কার জানিয়ে গেছেন। স্বামীজী প্রাচীন ভারতবর্ষের এই মহোত্তম মানবতার আদর্শের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন বার বার আমাদের আত্মস্থ ও স্বধর্মনিষ্ঠ প্রয়োজনে। আমরাই যে যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদের আদি প্রবর্তক—একথাটা আমাদের চিত্ত-চেতনার দরজায় তিনি পৌঁছে দিতে প্রয়াসী ছিলেন এই কারণেই—যে নতুন যুগের পৃথিবীতেও আমরাই যেন সেই উজ্জ্বল উত্তরাধিকারের গৈরিক পতাকা বহন করে নিয়ে যেতে পারি অগ্রগামীর গৌরবদৃপ্ত ভূমিকায়। তাই স্বামীজী বলেছিলেন—"এবার কেন্দ্রে ভারতবর্ষ।"

পরানুবাদ পরানুকরণের অতল অন্ধকারে স্বধর্মভ্রষ্ট জাতির প্রতি স্বামীজীর সতর্কবাণী

কিন্তু আমরা তা পারিনি। অবক্ষয়ের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে আজ আমাদের অন্যরূপ, রূপান্তর এবং অন্যতর জঘন্য এক ভূমিকার অসহায় প্রস্তুতিতে সমাচ্ছন্ন আমাদের উত্তরাধিকার। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত— যে দেশের মানুষ আবহমান কাল থেকে সর্বত্রই সমাজবোধের প্রাগ্রসর চেতনায় সদা জাগ্রত এবং বিশ্ব-কল্যাণ-কর্মে নানাভাবে যুক্ত, সেই মহান দেশের অক্ষম অপদার্থ উত্তরাধিকারী আমরা ইওরোপের কাছে যাচ্ছি আজ সমাজতন্ত্রবাদের পাঠ গ্রহণ করতে। এর চেয়ে পরিতাপের, এর চেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে? এবং সে আবার কোন্ ইওরোপ? মানস-প্রকর্ষে, হৃদয়ের ঐশ্বর্যে এবং মানবিকতার প্রত্যয়ে যে ইওরোপ আজ দেউলিয়া হয়ে গেছে—বিচ্ছিন্নতাবাদের (Alienation) অন্ধ তমসায় আবৃত যাদের প্রত্যেকটি গৃহ-পরিধি—সমাজ পরিবার সংসার বলে আজ আর যাদের জীবনে কিছু অবশিষ্ট নেই—মায়ের সঙ্গে সন্তানের যেখানে একমাত্র জন্ম দেওয়া ছাড়া আর প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই—ভাই-বোন কেউ কাউকে চেনে না—আত্মীয়-স্বজন প্রিয়-পরিজন বলে যাদের আর কিছু নেই, দৈহিক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, একটি শব্দ "Uncle" দ্বারা কাকা-জেঠা-মামা-মেসো-পিসে সব বোঝানো হয় যাদের দিগ্বিজয়ী ভাষায়, নিজের সন্তানের গৃহে এক বেলা অন্ন গ্রহণ করতে হলে যে দেশে অর্থের বিনিময়ে পেয়িং গেষ্ট হয়ে প্রবেশ করতে হয়,—প্রীতি ও প্রেমের ঐক্যে যারা নিজেদের ক্ষুদ্র সংসারটিকে পর্যন্ত বাঁধতে পারেনি, স্থাপন করতে পারেনি শান্তির স্বাভাবিক সচ্ছল নীড়,—তাদের কাছে সমাজতন্ত্রবাদের কী শিখবে ভারতবর্ষ? কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটছে। আমদানি করছি তাদের জীবনের, তাদের সমাজের অমানবিক নানা রীতি-নীতি, জীবন রচনার অক্ষম অলীক নানা উপাদান এবং নোংরা সব আবর্জনা। শুধু তাই নয়, বিশেষ কোনো দেশের "Chairman"কে আমরা আমাদের "Chairman" বলে গ্রহণ করতে শিখছি। এবং

বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণে গড়ে উঠছে আমাদের রাজনৈতিক দল। এমনকি আমাদের "প্রত্যহ-জীবনে পর্যন্ত" ঢুকে পড়ছে ওদের দেশ থেকে আমদানি করা নানা নোংরামি স্বৈরাচার, ঔদ্ধত্য ও অসংযম। আমাদের রাজনীতি, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের সাহিত্য, শিল্প, বেশভূষা, সবই আজ বিদেশীদের অনুকরণে। কয়েকটি বৃহৎ দেশ নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের রাজনীতি, আমাদের অর্থনীতি, এমনকি আমাদের সমাজনীতিও। আজো আমাদের সমান মোহ রয়েছে বিদেশী জিনিষ, বিদেশী ডিগ্রী, বিদেশী শিক্ষার প্রতি। শুধু বসনে ভূষণে ভাষণেই নয়, পরন্তু দেশের বাতাবরণ ও নিসর্গ-নিয়ন্ত্রিত অশন-বিলাস-ব্যসনের যে স্বাভাবিক সহজ রীতি-পদ্ধতি জাতীয় জীবনের সঙ্গে স্বাস্থ্য-সম্পদ-সৌন্দর্য প্রভৃতি নানা দিক থেকে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে বিধৃত ও অচ্ছেদ্য বলে খাদ্য-বিশেষজ্ঞ ও প্রাণিবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, অন্ধ পরানুবাদ ও পরানুকরণের দুর্মর মোহে সে সব রীতি-পদ্ধতি উল্লঙ্ঘন করে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষায় অস্বাস্থ্যকর, প্রায় অখাদ্য, বিজাতীয় বিচিত্র নানা খাদ্যতালিকা আমাদের খাবার টেবিলে নিয়ে এসেছি। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে, একান্তভাবে যা পুষ্টি-স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য-সম্মত—সেই ফল-মূল-শাক-সবজি,—চিরকালের সেই তেতো-শুক্তো-ঝাল-ঝোল-চচ্চড়ি ফেলে দিয়ে আমরা এখন টোস্ট্-রোস্ট্-চপ-কাটলেট্ আর প্যাটিস্-চাউমিনে মজে গিয়েছি। পরিত্যাগ করে পায়েস-পিঠে-দই-রসগোল্লা, অসহায় আত্মসমর্পণ করেছি কাস্টার্ড-কেক-প্যাস্ট্রির কাছে। হিঞ্চে-কলমী-নালতে-শুষ্ণীর নাম পর্যন্ত শুনিনি আমরা ভুঁইফোড় একালের উন্নাসিক আঁতেল বাঙালী সন্তানেরা।

আর বিলাস-ব্যসনের নামে পাশ্চাত্যের নির্লজ্জ ভয়াবহ অন্ধ অনুকরণের যে উদ্দাম প্রদর্শনী চলেছে সারা দেশ জুড়ে—তার কথা লিখতেও লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়, দুঃখ হয়। অদ্ভুত বিচিত্র সব সাজ-পোশাক-প্রসাধনে আজ আর বোঝা যায় না কে ছেলে আর কে মেয়ে! এদেশের জলবায়ুতে মদ্য একটি অপ্রয়োজনীয় অতি সর্বনাশা পানীয়; অথচ এখন শুধু হোটেল-রেস্তোরাঁ-ক্লাবেই নয়, ঘরে বাইরে এমন কি স্কুলে কলেজে, পবিত্র আমাদের পারিবারিক গৃহ-পরিধিতেও চলেছে উন্মত্ত উদ্দাম যথেচ্ছ মদের ব্যবহার—স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। মদের যেন স্রোত বয়ে যাচ্ছে সারা দেশে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে হোটেল-রেস্তোরাঁ-ক্লাব-কফিহাউস থেকে জন্মলাভ করেনি

আমাদের ভারতীয় সভ্যতা। একান্তভাবেই পরিবার-কেন্দ্রিক আমাদের এই প্রাচীন সভ্যতা—ক্লাব-কফি হাউসের সংস্কৃতি থেকে একেবারেই আলাদা—বলা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত কোটীর। তাই এইসব আমদানি-করা পরানুবাদী প্রগতিবাদ আমাদের প্রাণ-প্রবাহের, জীবন-রচনার একান্তই পরিপন্থী। অথচ ঐ হোটেল-রেস্তোরাঁ—, ক্লাব-কফি হাউসেই—সকালে সন্ধ্যায়—গভীর রাত্রি পর্যন্ত আমাদের একালের আঁতেলদের নিত্য গণ-পরিষদ।

নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তারুণ্যেরই ধর্ম এবং বৃহত্তর জীবনের পরিপ্রেক্ষায় নতুনকে স্বাগত জানাবার উদারতা-সহিষ্ণুতাও প্রাণবান জীবন্ত জাতির পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এবং স্বামীজী চিরকাল এই দুরন্ত তারুণ্যের, এই পবিত্র প্রাণশক্তির পূজারী। বস্তুতঃ যেখানে যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর ও শ্রেয়, সার্বিক কল্যাণের অনুগামী তাই দিয়েই রচনা করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী নতুন এক কল্লোলিনী তিলোত্তমা ভারতবর্ষকে। কিন্তু অপর জাতির কাছ থেকে এই সব নতুন সামগ্রী, জীবনরচনার উপাদান গ্রহণ করতে হবে—নিজের স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে। তাই স্বামীজীর সতর্কবাণী :—"এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে ; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর ; তাহার নাশ কে করে?" সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজীর ভাষায় নিবেদিত স্বামীজীর এই জীবনদর্শনও অবশ্য স্মরণীয় : "আমি আমার গৃহটিকে চতুর্দিকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে চাই না, চাই না আমার দরজা-জানালা সব অর্গলবদ্ধ থাকুক। আমি চাই সকল দেশের, সব মানব-সংস্কৃতির মুক্ত প্রাণপ্রবাহ স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিকভাবে আমার অঙ্গন-প্রাঙ্গণ স্পর্শ করে, আমার গৃহের মধ্য দিয়ে বয়ে যাক। কিন্তু আমি কিছুতেই চাইব না—কারো দ্বারা আমার নিজস্ব দাঁড়াবার ভূমি থেকে আমি বিচ্যুত হই, আমার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের শিকড়-সন্নিধি উন্মূলিত হোক।"

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সকল ব্যাপারে নতুনকে স্বাগত জানাতে চিরকাল

স্বামীজী যথার্থ প্রগতিবাদীরা মহান অগ্রগামীর ভূমিকাই গ্রহণ করে গেছেন। কিন্তু তাই বলে খাদ্য-পানীয়ের যে আদি উদ্দেশ্য—স্বাস্থ্য ও প্রাণধর্মের পরিপুষ্টি—তাই যদি বিঘ্নিত হয়, ব্যাহত হয়—, তাহলে তাকে বোধ হয় আর খাদ্য বলা চলে না—। এবং তা গ্রহণ করা আত্মহত্যারই নামান্তর। এবং আমরা সেই আত্মহননের পথেই পা বাড়িয়েছি। এবং সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়—যে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী সমাজ—দেশের ও জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, সভ্যতার রথরজ্জু যাঁদের হাতে—তাঁদেরই তীর্থক্ষেত্র আজ খালাসীটোলা; তাঁরাই ডুবে আছেন মদের পিপেয়। শুধু তাই নয়, যথেচ্ছ মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক বিকৃত জীবন-যাপন-পদ্ধতিই সাহিত্য শিল্প রচনার পক্ষে অবশ্য কৃত্য বলেও এঁরাই ঘোষণা করছেন। বিদেশী সভ্যতার প্রবেশ-লগ্নেই স্বামীজী সম্ভাব্য এই আত্মঘাতী ভয়াবহ পরিণামের কথা জানতে পেরেছিলেন এবং উপযুক্ত প্রতিষেধকেরও ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রহণ করিনি তাঁর কথা। নেশা যখন প্রবল হয়—দৃষ্টিও হয়ে যায় অন্ধ। বিনাশের পথে দ্রুত ধাবমান জাতির সেদিকে নজর দেবার সময় কই? অথচ এই পরানুকরণ পরানুবাদ এবং স্বধর্মচ্যুতির ফলে যা হবার তাই ঘটছে এখানে। চারিদিকে সর্বনাশ, বিধ্বংসী অবক্ষয় এসে ঘিরে ধরেছে অসহায় আমাদের; বুঝতেও পারছি না। স্বামীজী সেই কবে পরধর্ম গ্রহণের ভয়াবহ পরিণামের কথা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন—"অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে...... হীন কাপুরুষের মতো অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয় না, বরং উহা মানুষের ঘোর অধঃপতনের চিহ্ন।......অবশ্য অপরের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে; যে শিখতে চায় না, সে তো পূর্বেই মরিয়াছে। ......অপরের নিকট ভালো যাহা কিছু পাও শিক্ষা করো, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইও না; এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতি বিশেষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভালো হইত।" উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি একটু লক্ষ্য করে

অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে স্বামীজীর সমস্ত নির্দেশ-নিষেধ অগ্রাহ্য করে উন্মাদের মতো আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি। পশ্চিমের বিজ্ঞান কারিগরি বিদ্যা শিখতে বলেছিলেন ঠিকই স্বামীজী। এই উপদেশটি আমরা শুনেছি এবং ফলও হাতে হাতে পেয়েছি। পৃথিবীর প্রথম সাত-আটটি শিল্প-সমৃদ্ধ দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি বিশিষ্ট স্থান আজ অধিকার করেছে। পঞ্চশীল নীতি অনুসরণ করে আমাদের পররাষ্ট্র নীতিতেও ভারত স্বামীজীর অনুশাসন মেনে একটি বিশিষ্ট আদর্শ অনুসরণ করে সুফল পেয়েছে। কিন্তু যে ভয় তিনি করেছিলেন যে পাশ্চাত্য বিদ্যা শিখতে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গিয়ে আমরা না স্বধর্ম-ভ্রষ্ট হয়ে পড়ি। ঠিক তাই-ই ঘটেছে। তাঁর সতর্কবাণী আমরা গ্রাহ্য করিনি। কিংবা অন্ধ নেশা প্রলুব্ধ করে আমাদের টেনে নিয়ে গেছে আপাতঃমধুর ধ্বংসের অভিমুখে।

জিজ্ঞাসা নেই। বিচার নেই। বিতর্ক নেই। সাহেবেরা বলেছে ধর্ম হল আফিমের মতো—মানুষের সর্বনাশ করে। অতএব ধর্ম পরিত্যাজ্য। আমরা সাহেবের কথাকে বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছি। অথচ সাহেবদের রবিবারের ধর্মের সঙ্গে আমাদের প্রত্যহ—প্রতি মুহূর্তের আচরিত ধর্মের যে কোনো সামান্যতম যোগ নেই একথাটা কে বোঝাবে? আমাদের কাছে ধর্ম তো শুধু আচার-অনুষ্ঠান মাত্র নয়, পুরোহিততন্ত্র নয়, পরন্তু জীবন-প্রত্যয়। আন্তর শক্তিতে হয়ে ওঠার পথ-নির্দেশের নাম ধর্ম। বৃহতের অভিমুখে পথ চলার পবিত্র সংকেত। অনুভবের ঐশ্বর্যে হৃদয়কে প্রসারিত করে দেবার শক্তি যোগায় ধর্ম। আমাদের ধর্ম প্রতিমুহূর্তে হয়ে ওঠার সাধনা। স্বামীজী তাই বললেন: "অদ্বৈতবাদ, ও অন্য কোনো বাদ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে।" আসলে মানুষকে তার নিজের মতো করে হয়ে উঠতে হবে—ফুটে উঠতে হবে। আত্মবিকশিত হয়ে উঠতে হবে। এই আত্মবিকাশ, মানুষের এই অবিরাম হয়ে ওঠার সাধনাই তার ধর্ম। এবং এ ধর্ম মানবধর্মের সমান্তরাল। তাই সকলের পালনীয়। কিন্তু তাই বলে এই ধর্ম জাতশুদ্ধ সকলের জন্য মোক্ষ সাধনের ব্যবস্থাপত্র (prescription) মাত্র নয়। বাস্তববাদী স্বামীজী তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন: "যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালোই; কিন্তু তা

হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ করো, তবে ত্যাগ হবে।… যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক লক্ষ্য সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে।" ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভুলে গেছি আমাদের নিজস্ব সেই সব মহান উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। বিদেশীদের দৃষ্টিতে দেশকে দেখার এই বিড়ম্বনা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র। এবং স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর তা যেন আরো বেড়েছে।

১৮

সংস্কৃত ভাষা, ভারতচেতনা ও জাতীয় সংহতি

ঠিক এভাবেই উপরওয়ালা সাহেবেরা বললেন সংস্কৃত মৃত ভাষা (dead language); এ যুগে আমাদের জীবনে এর কোনো উপযোগিতা নেই। অতএব ত্যাগ করো। আমরাও সুবোধ বালকের মতো সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ত্যাগ করলাম। এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যনির্ঘন্ট (সিলেবাস) থেকে সংস্কৃত তুলে দিলাম। অথচ সংস্কৃতই ভারতবর্ষের একমাত্র উজ্জ্বল সার্বভৌম উত্তরাধিকার। এবং এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই আমরা একদা লাভ করেছিলাম সুদৃঢ় জাতীয় সংহতি। আসামে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক কালের আত্ম-বিধ্বংসী নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে আমাদের রাষ্ট্র-কর্ণধারগণ এবং আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ আজ জাতীয় সংহতির প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে বিব্রত বোধ করছেন এবং নানা রকম চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন। অথচ ভারত-সংহতির একমাত্র উৎস ও প্রতিশ্রুতি সংস্কৃতভাষাকে অনায়াসে কবেই আমরা বিসর্জন দিয়েছি ভারত মহাসাগরের অতলান্ত নীল জলে। স্বাধীনতার পর থেকে সমকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মহান সংস্কৃত ভাষাকে এতটুকু মর্যাদা দিতে পারিনি আমরা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নির্মুক্ত ও উদাসীন। নব মর্যাদার কথা ছেড়েই দিলাম; এমন কি স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে সংস্কৃত ভাষার যেটুকু সামান্য চর্চা, যেটুকু প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল, তাও আজ ক্রম-সঙ্কুচিত হতে হতে তার অস্তিত্বই আজ প্রায় বিলীয়মান। এতবড় স্বাধীন দেশের কোথাও এতটুকু ভূমি পর্যন্ত নেই

সংস্কৃত ভাষার পুনর্বাসনের জন্য। সাহেবমুখী আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাসন দিয়েছি আমরা সংস্কৃত ভাষাকে—সংস্কৃত সাহিত্যকে। এবং আমাদের মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার ভারতের বাইরে বিভিন্ন ইওরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন কি সাম্যবাদী রাশিয়ায় পর্যন্ত সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজ ক্রম-প্রসারিত। এই প্রসঙ্গে বহু ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী, রুশী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ, প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ ও ভারততত্ত্ব-গবেষকদের নাম মনে পড়ে—যাঁদের শ্রমনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বহির্বিশ্বে আজ পরম সম্মানের ও মহৎ মর্যাদার স্বর্ণ-সিংহাসনে সমাসীন। এটুকুই আমাদের যা সান্ত্বনা।

অথচ আমাদের পূর্বজেরা সুদূর অতীতে সুদৃঢ় একটি জাতীয় সংহতি—তাঁরা কত সহজে অর্জন করেছিলেন। এবং তা এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই। নানা জাতি—নানা ধর্ম—নানা মতের এই আমাদের বিচিত্ররূপিণী ভারতভূমিকে একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মিলন-সূত্রে বেঁধে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন আমাদের পূর্বসূরী আচার্যগণ। যেন সেই স্বর্ণ-সংহতিরই পরিণাম স্বরূপ—আজো এই আসমুদ্র-হিমাচল বিশাল ভারতভূমির। মানুষ তাঁদের বিভিন্ন পূজা-পার্বণে, আচার-অনুষ্ঠানে ও ধর্ম-কর্মে যে সব সংস্কৃত মন্ত্র ও শ্লোক আবশ্যিকভাবে উচ্চারণ করে চলেছেন—তাদের মধ্য থেকে এখানে মাত্র দুটি মন্ত্রগুচ্ছের উল্লেখ করছি :

(১) গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। / নর্মদে সিন্ধু কাবেরি—জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু ॥ / (২) কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করানি চ। / তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নান-কালে ভবন্তি হ ॥

—এখানে প্রথম মন্ত্রে ভারতবর্ষের নদীগুলির এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে আমাদের দেশের তীর্থস্থানগুলির ভৌগোলিক অবস্থান স্মরণ করলেই আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তুষার-কিরীটিনী ভুবনমোহিনী মহামহীমময়ী ভারতজননীর রূপাবয়ব এবং বোঝা যাবে আমাদের ভারত-চেতনা ও জাতীয়তাবোধ পাশ্চাত্য দেশের আমদানিকৃত কোনো সুলভ পদার্থ মাত্র নয়। পরন্তু এই উদার সার্বভৌম মহান জাতীয় সংহতির উৎস—ভারত ইতিহাসের একান্ত মৌন মর্মমূলে। যদি চ যবনপণ্ডিতের গুরুমারা

চেলাদের মুখে আজো আমাদের শুনতে হয়—ভারতচেতনা, জাতীয়তাবোধ ও দস্বেশপ্রেমের প্রথম পাঠ না কি গ্রহণ করেছি আমরা লুণ্ঠনব্যবসায়ী পররাজ্য-লোলুপ ইওরোপীয় বণিকদের কাছে। একথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, সে যুগে অর্থনৈতিক সংহতির কোনো প্রশ্নই ছিল না, আর ইওরোপীয় জীবন-ধারা-জাত আগ্রাসী তথাকথিত জাতীয়তাবোধও রাষ্ট্রীয় সংহতি কোনোদিনই কাঙ্ক্ষিত ছিল না আমাদের, কারণ ও বস্তুতে আমাদের বিশ্বাস ছিল না। প্রেমের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ, ধর্মের ও নীতির অনুশাসনে সংহত, সচ্ছল সুন্দর একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতির মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ও গ্রাম-কেন্দ্রিক আমাদের পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ জীবনধারা ছিল পরিপূর্ণ বহতা নদীটির মতোই। এবং সংস্কৃত ভাষাই ছিল সেই মহান সুসংবদ্ধ সমাজমুখী ভারতীয় জাতীয় সংহতির একক ধারক ও বাহক—এবং ভবিষ্যতেরও পথ-নির্দেশক। স্বামীজী তাঁর বক্তৃতাসমূহে ও পত্রাবলীতে সংস্কৃত ভাষা ও জাতীয় সংহতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক-প্রসঙ্গ বার বার উল্লেখ করে আমাদের সতর্ক করে—ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ রেখে গেছেন। আসমুদ্র-হিমাচল সকল ভারতবাসীর মধ্যে আবার সংস্কৃত ভাষার প্রসার ঘটুক স্বামীজী তা মনে প্রাণে চাইতেন। দেশের সকল মানুষের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার সার্বিক একটি সহজ ব্যবস্থারও স্বপক্ষে ছিলেন স্বামীজী। তিনি মনে করতেন এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই আবার আমাদের জাতীয় ঐক্য স্থায়ী হবে এবং আমাদের অতীতের মতো ভবিষ্যতেও এক স্মরণীয় দীপ্ত সম্ভাবনা ফিরে আসবে জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে। তাছাড়া অতীতকে অস্বীকার করে কোনো জাতি বাঁচতে পারে না। বিশেষ করে সে অতীত যদি জীবনের অভিমুখী সম্পন্ন ঐশ্বর্যের অধিকারে এত মহান হয়, তবে তা বার বার আমাদের স্মরণ করতে হবে এবং দৃষ্টির সম্মুখে রাখতে হবে। জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের প্রয়োজনেই উজ্জ্বল অতীতকে আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে। তাই স্বামীজী বললেন: "যতদূর পারো অতীতের দিকে তাকাও, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জল পান করো। তারপর সম্মুখ প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হও এবং ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, অধিকতর মহিমমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করো।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবুধমণ্ডলী সংস্কৃতকে একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে অভিহিত কবে পরম মর্যাদার আসন দান করে গেছেন। এবং শুধু মাত্র বাঙালী বা ভারতীয় পণ্ডিতেরাই নন, পরন্তু যাঁদের মূল্যায়নের আজো আমরা সব চেয়ে বেশী মর্যাদা দেই, সেই রাজার জাতি, সাহেব-বংশ-অবতংস পাশ্চাত্যের বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতত্ত্ববিদ্গণও একবাক্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেব মহিমা কীর্তন করে গেছেন এবং এখনো তাঁদের দেশেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও গবেষণা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এবং সেই সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত ভগবদ্গীতাকে জার্মান দার্শনিক সোপেনহাউয়র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং বিপন্ন বিধ্বস্ত এই মর্ত্য-পৃথিবীতে মানুষের একমাত্র সান্ত্বনা ও শান্তির শাশ্বত উৎস বলে অভিনন্দিত করেছেন। এবং আর এক বড় সাহেব স্যার উইলিয়ম জোন্স, যিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণপুরুষ ও সভাপতি ছিলেন এবং যিনি আধুনিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের স্রষ্টা-জনক বলে সর্বজনস্বীকৃত ও সর্বজনবন্দিত, সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়: "The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident" তিনি গ্রীক, লাতিন শুধু নয়, জার্মান-ফরাসী-ইতালিয়ান প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার সঙ্গেও নানা দিক থেকে সর্বাত্মক তুলনা করে সংস্কৃতকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করে গেছেন। অথচ সেই ভাষাকে আমরা ভারতবাসীরা নিতান্ত অবহেলায় পরিত্যাগ করেছি। অপরদিকে চোখের উপর আমরা দেখলাম চীনা ভাষার মতো অসংস্কৃত, অপরিণত, অবৈজ্ঞানিক, অসমাপ্ত, আদিম চিত্রধর্মী একটা ভাষাকে নব্য চীনের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং চীনা জ্ঞানী-গুণী-ভাষাতত্ত্ববিদ্-সাহিত্য-পারঙ্গম পণ্ডিতবর্গ মিলে অনেক অধ্যবসায়, বহু পরিশ্রমের বিনিময়ে নিজেদের জাতীয় জীবনের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির প্রয়োজনেই, পূর্ণ পরিণত জাতীয়তার শ্লাঘ্য সার্বভৌম

প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত একালের উপযোগী করে প্রায় আধুনিক একটি সচ্ছল ভাষায় রূপান্তরিত করে নিয়েছেন। তাঁরা কিন্তু সাহেবদের বা অন্য কারো কথা শুনে তাদের আদিম মাতৃভাষাকে পুরোনো, "অব্‌সলিট্" ও "ব্যাক-ডেটেড্" বলে পরিত্যাগ করেন নি।

অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ, একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যাকরণ ও শুদ্ধ ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে অনন্যসাধারণ অতুলন এবং নতুন শব্দ-সৃজনের ক্ষমতায় অদ্বিতীয় একক, এবং যে ভাষায় পৃথিবীর মহত্তম মহাকাব্যদ্বয় বিরচিত, যে ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থনিচয়ের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, যে ভাষায় আচার্য শঙ্করের প্রতিভা বিধৃত এবং তাঁর রচিত ভাষ্যধারা প্রবর্ষিত, যে ভাষায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সংকলিত, যে ভাষায় পেয়েছি আমরা মানবজাতির অমূল্য সম্পদ উপনিষদসমূহ এবং ভগবদ্গীতার মতো মহাগ্রন্থসকল, যে ভাষায় কালিদাস-মাঘ-শ্রীহর্ষ-বাণভট্ট-ভবভূতি-ভাস-ভর্তৃহরি প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকারের কলাকৃতি উপস্থাপিত, যে ভাষায় ভরত-অভিনবগুপ্ত-পণ্ডিতরাজ-কুন্তক-বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতির নন্দনতত্ত্ব ও অলঙ্কারশাস্ত্রসকল নির্মিত যে ভাষায় কাত্যায়ণ, বৌধায়ণ, আপস্তম্ভ প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের জ্যামিতি, গণিত ও বীজগণিতের প্রাচীনতম আবিষ্কার ও সূত্রগুলি এবং কনাদ, নাগার্জুন, চরক, শ্রুশ্রুত, জীবক, ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট, সুঞ্জাল, পিঙ্গল, ব্রহ্মগুপ্তের মতো পৃথিবীর প্রাচীনতম পদার্থ-বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ ও চিকিৎসাশাস্ত্রীদের মৌলগবেষণার ফসলগুলি সংগৃহীত এবং যে ভাষা সমগ্র জাতির একমাত্র উজ্জ্বল উত্তরাধিকার—আমাদের সেই মাতা-মাতামহ, পিতা-পিতামহের ভাষাকে আমরা বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন করেছি।

১৯

ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও পরধনলোভে মত্ত ভারত

শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, স্বামীজীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমরা আমাদের কোনো ঐতিহ্যকেই শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে শিখিনি, শ্রদ্ধিত মানবিক অনুরাগে পূর্বপুরুষের স্বর্ণদীপ্ত উত্তরাধিকারের দিকে একবার ফিরেও তাকাইনি। অথচ মাতৃভাণ্ডারের বিবিধ অমূল্য রতন, (অবোধ আমরা) অবহেলা করে পরধনলোভে মত্ত, অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে

ভিক্ষা বৃত্তি আচরণ করে চলেছি। বিবর্ণ দেউলিয়া ইওরোপ-আমেরিকা, অথবা সাম্প্রতিককালে জেগে ওঠা চীন-রাশিয়ার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছি। মাতৃভাণ্ডারের অপার ঐশ্বর্য-সম্পদের কোনো সন্ধানই করলাম না—করছি না আজো আমরা। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা, তাদের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা শিখতে গিয়ে পাশ্চাত্যের আপাত-রম্য জলুসে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েছি আমরা। স্বামীজী এই আশঙ্কাই করেছিলেন, "যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে।" কিন্তু ঘরের সম্পত্তি আমরা সম্মুখে রাখতে চেষ্টাই করিনি, এবং দেশের সাধারণ মানুষ তাহাদের পিতৃধন সম্পর্কে কোনো পরিচয়ই লাভ করতে পারেনি। ফলতঃ দেশের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্কহীন, পিতৃসম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আমাদের ভারতবাসীদের অবস্থা অনেকটা মাতা-পিতৃপরিচয়হীন, ছন্নছাড়া, অসহায় দরিদ্র বালক-বালিকাদের মতো। তাই আমরা ক্রমশঃই ডুবে যাচ্ছি অবক্ষয়ের অন্তহীন অন্ধকারের রসাতলে। মাতা-পিতৃপরিচয়হীন বলেই ভাইয়েরা আমরা কেউ কাউকে চিনি না, জানি না পরস্পরের কোনো সংবাদ। তাই দেশজুড়ে শুরু হয়ে গেছে ভাই-এ ভাই-এ হানাহানি, ঝগড়া, হিংসা-খেয়োখেয়ি। হিংসা, বিদ্বেষ, আর ষড়যন্ত্রের, উন্মাদ ভ্রাতৃ-কলহের পরিণামে বিধ্বস্ত, বিপন্ন সারা দেশ। আত্ম-হননের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সর্বস্বান্ত করছে আমাদের সকলকে। পিতৃধনের সম্পর্ক-বর্জিত অপরিচয়ের অন্ধকার থেকেই জন্মলাভ করেছে আজকের এই হিংসা, বিদ্বেষ আর পরশ্রীকাতরতা আর এই অর্থহীন ভ্রাতৃহনন আর সর্বনাশা আত্মহা বিচ্ছিন্নতাবাদ। পাঞ্জাব জ্বলছে, বিধ্বস্ত আসাম, রক্তাক্ত ত্রিপুরা মণিপুর, ভ্রাতৃঘাতী আগুন ছড়িয়ে পড়েছে কাশ্মীরের পথে প্রান্তরে, দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণী ভাইয়েদের সঙ্গে

উত্তরাপথের ভাইয়েদের সংঘাত শুরু হয়ে গেছে কোথাও কোথাও, এছাড়াও রয়েছে জাতপাত, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি নানা ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন নানা নামে ভিতরে ভিতরে বিদ্বেষহিংসার সুপ্ত বহ্নি। বিদেশী স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী সরকারের "বিভক্ত করো এবং শাসন করো" (Divide and Rule) নীতি, কিছু বৃহৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তির ভারতের প্রতি অন্ধ ঈর্ষা ও বিদ্বেষ, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পরশ্রীকাতরতা এর জন্য দায়ী হলেও, আমাদের মাটির সঙ্গে, মাটির মানুষের সঙ্গে, আমাদের জীবন পদ্ধতি, পরিবেশ ও আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভিন্ন বিদেশী মতবাদের শরণাগত না হয়ে, রাজনীতির চোরা-বালি এড়িয়ে প্রথম থেকেই স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে আমরা যদি মেনে চলতাম স্বামীজীর পথ-নির্দেশ, অন্ততঃ সামান্যতম অনুসরণ করতেও প্রয়াসী হতাম ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনচর্যা, এ সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের জীবনে অনূদিত বাস্তব জীবনানুগ আদর্শগুলি, তাহলে আজ এই ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হতে হতো না আমাদের। তাঁদের কোনো কথাই কি শুনেছি আমরা? স্বামীজী একদিকে যেমন ঘোর জড়বাদের অন্ধ অনুসৃতির প্রসঙ্গে আমাদের সতর্ক করে গেছেন, ঠিক তেমনই আবার করুণ কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হবার বিপন্ন প্রবণতা সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করে গেছেন তিনি: "একদিকে পাশ্চাত্য বিদ্যার মদিরা পানে মত্ত হইয়া আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; তাহারা প্রাচীন ঋষিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হিন্দু জাতির সমুদয় চিন্তা কেবল কতকগুলি আবর্জনার স্তূপ, হিন্দু দর্শন কেবল] শিশুর আধ-আধ কথা এবং হিন্দুধর্ম নির্বোধের কুসংস্কার মাত্র। অপর দিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু তাঁহারা কতকটা বাতিকগ্রস্ত, তাঁহারা আবার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা সব ঘটনাকেই একটা শুভ বা অশুভ লক্ষণ রূপে দেখিয়া থাকেন।...তিনি যে জাতি-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার বিশেষ জাতীয় দেবতার অথবা তাঁহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার আছে তাহার দার্শনিক, আধ্যাত্মিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রস্তুত।" বস্তুতঃ আজো আমরা সেদিনের মতোই দুদলে বিভক্ত হয়ে স্ব-স্ব অভিমত প্রতিপাদনের তাড়নায় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে উন্মাদ বিতর্কে ও কলহে উদ্দাম হয়ে আছি। ইতোমধ্যে অনেকে আবার বিভিন্ন

দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শে নিজেদের বিভক্ত করে কারোর এ লাইন, কারোর বা সে লাইন নিয়ে আত্মকলহে মেতে আছি। বিবেকানন্দ—কে না কে এক ব্যক্তি—তাঁর কথা শোনার মতো আমাদের অবসর কোথায়?

২০

প্রসঙ্গ জাতিভেদপ্রথা ও ছুঁৎমার্গ

স্বামীজী ছুঁৎমার্গী ভারতবাসীদের জন্মগত জাতিভেদ-প্রথা বিসর্জন দিতে বলেছিলেন। বলেছিলেন হিন্দুদের বর্তমান জাতিভেদ-প্রথা একটি অন্ধ কুসংস্কার মাত্র। বলেছিলেন: যেহেতু সমস্ত রকম কূপমণ্ডুকতাই মানবতার শত্রু, সেইহেতু শক্তিক্ষয়কারী, আমাদের জাতীয় সমুন্নতির প্রধান অন্তরায়, মহা-অনিষ্টকারী এই জাতিভেদের দুরূহ অচলায়তন থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে। জাতিভেদ-প্রথা পরিত্যাগ করতে। কিন্তু শুনিনি তাঁর সে কথা। মুখে আমরা প্রগতিসম্পন্ন যত বড় বড় কথাই বলি, কাজে আমরা আজো পুরোনো সেই "উচ্চ-নিম্ন অসবর্ণের" অন্তহীন গোলকধাঁধায় অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছি। "বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান"—বলে ঘরের ছেলেমেয়েদের গান গাইতে শেখাচ্ছি, কিংবা "বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই"—প্রভৃতি মহৎ বাণী সকল শুদ্ধ উচ্চারণ করে আবৃত্তি করতে তালিম দিচ্ছি। সভাসমিতিতে আমাদের ছেলেমেয়েরা এইসব গান গেয়ে বা আবৃত্তি করে পুরস্কার টুরস্কার পেলেও আমরা পিতৃ-গৌরবে মাতৃগর্বে গদগদ হই। খুশী হই আমাদের পুত্র-কন্যাদের উপর। কিন্তু তারাই বড় হয়ে, এক জাতি—এক প্রাণ—একতার-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, কখনো তথাকথিত ভিন্নজাতে, চণ্ডাল মেথর নমশূদ্রের কথা ছেড়েই দিলাম, এমন কি বামুন হয়ে কায়েত বৈদ্যের ঘরে, কিংবা বৈদ্য হয়ে কায়েত-বামুনের ঘরে বিয়ে করে,—খড়্গহস্ত হয়ে আমরাই তখন সনাতন দেশের পিতামাতা, তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেই। শুধু তাই নয়, নানা রকম জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে, নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করে বিষময় করে তুলি তাদের বিবাহিত জীবন। অথচ আমরাই কিন্তু তাদের শৈশব থেকে শিখিয়ে এসেছি জীব-শিব-তত্ত্ব ও নানা সাম্যাদর্শের ব্রহ্মবাণী। এই হলাম আমরা! হায়রে

এই হল আমাদের দেশের মানুষের আসল রূপ, মূল মনোবৃত্তি! অবশ্য তার মানে এ নয়—রূপজ মোহে আকৃষ্ট হয়ে যখন তখন যাকে ইচ্ছে প্রেম নিবেদন করে ঘরে তুলে এনে কাম চরিতার্থ করা। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের নামে এই অবাধ পশ্বাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে কখনই সমর্থিত নয়—বলাই বাহুল্য। স্বামীজী-নির্দেশিত সেই কঠোর সামাজিক অনুশাসনটি এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়: "ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের, জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র …।" রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত জীবনাদর্শে স্বয়ং-বরণ স্বনির্বাচনের সঙ্গে স্বৈরাচার অসংযমের কোনো সম্পর্ক নেই একথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুতঃ মনে মুখে ও কাজে কোনো মিল নেই যাদের, আমরা সেই দুরাত্মা। অথচ ঠাকুরের দিকে চেয়ে দেখুন। "বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন"—বলে কায়েত বলরাম বসুর বাড়ীতে পাতা পেড়ে অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করছেন। ভক্ত অধর সেন জাতে সোনার বেনে। তাঁর বাড়ীতে গিয়েও খেয়ে আসছেন আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ। অথচ সোনার বেনেরা এখনো এই ১৯৮৬ সালেও আমাদের এই সমাজে জলাচরণীয় নন। মানুষ হয়ে, মানুষের হাতে; এক দেশের লোক হয়ে, একই বাতাবরণে লালিত পালিত হয়ে, একই রকম সুখে-দুঃখে, স্বপ্নে-সাধে মানুষ হয়ে নিজেরই স্বদেশবাসীর হাতে জল গ্রহণ করবো কিনা— ; এই দুর্ভাগা দেশে আজো এ নিয়ে প্রশ্ন! অস্পৃশ্যতা আজো এদেশে অভিশাপের মতো আমাদের সব কিছু নষ্ট ভ্রষ্ট করে দিচ্ছে। আজো আমাদের দেব-দেবীর মন্দিরে মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং মানুষের ছায়া মাড়ালে পর্যন্ত মানুষের পাপ হয় এদেশে! অথচ অস্পৃশ্য অন্ত্যজ ধনী কামারণীর হাতে থেকে প্রথম ব্রতভিক্ষা গ্রহণ করে ব্রাত্যজনের সখা শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত মিথ্যা জাত্যভিমানের প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন। আর ব্রাহ্মণ্য অভিমানের অর্থহীন আস্ফালনে ও অক্ষম গর্বে আমরা এখনো যখন তখন হরিজন-নিধনে উন্মত্ত হয়ে আছি। সাম্য ও সমানাধিকারের নানা উৎকৃষ্ট বচন উদ্গারে, ইন-কিলাব বিপ্লবের নানা উচ্চকিত কলকণ্ঠে আমাদের আকাশ-বাতাস মুখরিত; অথচ "পঞ্জিকা-পদীপিসী-হাঁচি-টিকৃটিকি"-র নানা অন্ধ আবর্তে আমরা এখনো অসহায় ঘুরে মরছি। দরিদ্র অশিক্ষিত অক্ষর-

জ্ঞানবিহীন বিহারী মেষপালকের সন্তান রাখতুরাম—তাঁকে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিতে রূপান্তরিত করে দিচ্ছেন, কুলহীন পিতৃপরিচয়হীন নটীবিনোদিনীকে যিনি তাঁর পুণ্যস্পর্শে চৈতন্যলোকে সমুত্তীর্ণ করে দেন, সবার অস্পৃশ্য অশুচি ব্রাত্য দক্ষিণেশ্বরের রসিক মেথর, গরীব গ্রাম্য খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ চীনু শাঁখারী প্রভৃতি সমাজের নীচুতলার নামগোত্রহীন সাধারণ জনদের স্নেহে-মমতায় বুকে তুলে নিতে যাঁর কোনো দ্বিধা নেই, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞ শিষ্যদের মধ্যে অব্রাহ্মণ, তথাকথিত অন্ত্যজ, সকল শ্রেণীর মানুষই রয়েছেন : তাঁর দেশের লোক হয়ে এখনো আমাদের অভিধানে "জলচল" কথার মতো অমানবিক শব্দের প্রয়োগে আমাদের কোনো লজ্জা নেই? লজ্জা হয় না, দুঃখ হয় না, আত্মাবমাননার বোধে মাটিতে মিশিয়ে যায় না আমাদের মাথা, রবিবারের দৈনিক পত্রিকায় "পাত্র-পাত্রীর" বিজ্ঞাপনে "উচ্চ অসবর্ণে আপত্তি নেই"-র মতো জঘন্যতম বাক্য ব্যবহার করতে এবং তা ছেপে প্রকাশ করতে? এর পরেও বলতে হবে আমরা আধুনিক? আমরা প্রগতিবাদী? এইসব ঘটনা ঘটছে আমাদের দেশে—অথচ এসব নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা সেই আমাদের অন্তরে, নেই কোনো যন্ত্রণার দাহ। নেই কোনো প্রতিবাদ।

২১
মিথ্যাচার ও ভণ্ডামিতে আচ্ছন্ন ভারত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মন-মুখ এক করার আদর্শ

বার বার শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের বলে গেছেন—মন মুখ এক করতে। আর আমাদের কর্মে-কথায়-চিন্তায় কোনো সঙ্গতি, কোনো যোগ নেই। সর্বত্র ভণ্ডামি আর মিথ্যাচার। আর চালাকি দ্বারা কিস্তি মাত করতে চাইছি সব সময় দেশশুদ্ধ সবাই মিলে আমরা। তিনি বলেছিলেন কলিতে সত্যই তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরতে। আর আমরা সবাই মিলে—আবাল-বৃদ্ধবনিতা আপামর জনতার সবাই অবিরাম মিথ্যা কথা বলে চলেছি। মিথ্যা ভাষণে কে কতটা তৎপর তারই যেন প্রতিযোগিতা চলেছে সমগ্র দেশ জুড়ে। সিগারেটের বাক্সের উপরে স্বাধীন দেশের সরকারী নির্দেশে ছাপা হচ্ছে নিয়মিত : "ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর"। অথচ সবাই আমরা

রাত-দিন সিগারেট কিনে কিনে খাচ্ছি। এবং সরকারের সাহায্য-পুষ্ট-স্বদেশী বণিক অবিরাম উৎপাদন করছে সেই সিগারেট। স্বাধীন দেশের সরকার, "সত্যমেব জয়তে"—যাঁর বহু বিঘোষিত রাষ্ট্রাদর্শ, সেই সিগারেট তৈরী করার ও বাজারে তা বিক্রয়ের জন্য সাগ্রহে অনুমতি দান করছেন। ছেলেমেয়েদের বলছি—সব সময় সত্য কথা বলবে, আবার অন্যদিকে যথেচ্ছ ঘুষের টাকা গোপন সূত্রে সংগ্রহ করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে সে টাকা দিয়ে রঙিন টিভি, না কি গাড়ী, না বাড়ির তেতলা বাড়ানো, অথবা সপরিবারে দূর ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হবে তার আলোচনা :—এ সবই অতি অবলীলাক্রমে চলছে আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের সমাজে। সমাজের, দেশের, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মঞ্চের নামী দামী সংস্কৃতিবান শিক্ষিত ধনী লোক থেকে শুরু করে দীনতম মজুর, দরিদ্র ভিখারী কেউ এখানে সত্য কথা বলে না। মন মুখের সামান্যতম মিল নেই আমাদের কারো চরিত্রে। ভয়াবহ আগ্নেয় পর্বত ভিসুবিয়স থেকে দুর্বার বেগে গলিত মৃত্যুস্রোত লাভা উদ্গিরণের অব্যবহিত পূর্বে তার পাদদেশে অবস্থিত পম্পেই নগরীর শেষের দিনগুলির কথা কেন যেন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমুন্নতি ও শুদ্ধি ছাড়া কোনো জাতি বেঁচে থাকতে পারে না—বার বার একথা বলে স্বামীজী আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণ,—যাঁরা 'কথামৃত' বা 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়েছেন জানেন, তোষামোদকারী—মোসাহেবের অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারতেন না, স্পর্শ করতে পারতেন না তাদের প্রদত্ত কোনো উপহার; হাত তাঁর বেঁকে যেত। কারণ যথোপযুক্ত শ্রমের বিনিময় ছাড়া অর্থোপার্জন সামাজিক পাপ; এবং এই পাপের অর্থে সংগৃহীত বস্তুনিচয় কোনো সামাজিক সৎ মানুষের গ্রাহ্য হতে পারে না। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক জীবন-প্রবাহকে কলুষ-গ্লানি-মুক্ত করতে, মানুষের পৃথিবীর শুচিতারক্ষার জন্য পরোক্ষভাবে সমাজবিরোধী অপরাধীদের 'একঘরে' চিহ্নিত করে—তাদের বর্জন করার শাস্তিদানের নির্দেশ দিয়ে গেলেন যুগাবতার। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ন্যায়-বিধান, পবিত্র পথনির্দেশ আমরা অগ্রাহ্য করেছি। আমাদের দাবি অনেক, কিন্তু নিজেদের উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবো না কেউ। অধিকারবোধ আমাদের প্রবল প্রখর, কিন্তু বিনিময়ে কোনো কর্তব্যই করবো না। কেউ কোনো

কাজ করবো না, অথচ অর্থ চাই আমাদের, চাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য,—বিলাসিতা—সব। ঘরে ঘরে তাই শ্রমহীন অপবিত্র পাপের উচ্ছিষ্ট অন্ন। এবং পাপার্জিত সেই অন্ন-পানে প্রতিপালিত সমগ্র দেশ আজ তোষামোদকারী দালাল মোসাহেবের জাতিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। সিংহাসনে ক্ষমতায় আসীন দলের পদসেবা আর তোষণ এবং অফিসে-আদালতে-স্কুলে-কলেজে জন-সাধারণেব কাজ ফাঁকি দিয়ে সেই জনসাধারণকেই চোখ-রাঙানো। শ্রমহীন কর্মহীন অলস অথচ ধূর্ত লোভী জাতির জীবনে তাই অবশ্যম্ভাবী কালো টাকার আর এক সর্বগ্রাসী ভয়াবহ অন্ধকার। অসামাজিকতার, অমানবিকতার, অবিরাম পাপেরই এই বিপন্ন অতল অন্ধকার থেকে কে আমাদের উদ্ধার করবে? কোথায় সেই পরিত্রাতা? স্বামীজী বলছেন, আমরাই আমাদের উদ্ধাবকর্তা। তাই দেশের যুবশক্তিব কাছেই স্বামীজীর একমাত্র আবেদন। দুঃসহ এই ভয়াবহ ক্রান্তিলগ্নে একমাত্র তারাই বাঁচাতে পারে দেশকে—জাতিকে—মানবসমাজকে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ সম্মুখে রেখে। কাক-পক্ষীতে ঠোকরায়নি, কোথাও একটু দাগ পড়েনি—এমন নিটোল ফলটিই তো পূজোয় লাগে। নর-নারায়ণের পূজোয়ও তাই—সংসারের কোনো মালিন্য স্পর্শ করেনি, নেই স্বার্থপর হিসেবী কোনো হীন বুদ্ধি, এমন পরিপূর্ণ পবিত্র ফল—অর্থাৎ যৌবন—শুদ্ধ যুবশক্তিরই প্রয়োজন। একমাত্র যৌবন জল-তরঙ্গই ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে পারে যুগসঞ্চিত এই পুঞ্জীভূত পাপরাশি, এই অক্ষম অসহায় কান্না-গ্লানি, বিদিশ বিপন্ন এই নিদারুণ অন্ধকার থেকে যুবশক্তিই রক্ষা করতে পারে আর্ত মানবতাকে।

২২

ভারতীয় নারী আদর্শের পরমা মূর্তি সারদা দেবী

নারী-নির্যাতন, সমস্ত মানবিক অধিকার থেকে নারীসমাজকে বঞ্চনা আমাদের অন্যতম জাতীয় পাপ বলে আগেই উল্লিখিত হয়েছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। সুতরাং নারীজাতিকে অপমান করে, তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে, তাদের অস্বীকার করে কোনো জাতি, কোনো দেশ

কোনো রাষ্ট্র বাঁচতে পারে না। শৈশব থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে, প্রতি পদক্ষেপে নারীকে পরম সম্মান দিয়ে দেবীর আসন দান করে গেলেন। নিজের সহধর্মিণী নারীকে তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মের যথার্থ অংশভাক্ এবং সমগ্র জীবনের সার্থক সহযোগী, সহযাত্রী করে তাঁর নিজের এই মর্ত্যজীবনের অবসানের পরে সমগ্র রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের একক অধীশ্বরী করে দিয়ে চলে গেলেন। বস্তুতঃপক্ষে নিজের গুরু এবং গুরুপত্নীর অতুলন দাম্পত্য জীবন এবং তাঁদের যৌথ জীবনচর্যা দেখেই নারীজীবনের যথার্থ আদর্শ কী—তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল স্বামীজীর কাছে। স্বামীজী নিজেই বলছেন: "আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মাতাঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী-মৈত্রেয়ী ভারতে জন্মাবে।" "তাঁর আবির্ভাব ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছে। যে আদর্শসমূহ—তিনি তাঁর জীবনচর্যায় রূপায়িত করেছেন এবং অপরকে আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন তা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নারীর বন্ধনমুক্তির প্রচেষ্টাকেই···সঞ্জীবিত করবে না, সমগ্র পৃথিবীর নারী-শক্তিকে প্রভাবিত করে তাদের হৃদয়ে ও মানসলোকে অনুপ্রবিষ্ট হবে।" আবার বললেন, "আমাদের এই যে সঙ্ঘ···তিনি তার রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সঙ্ঘজননী।" সারদা দেবীর তত্ত্বাবধানে নারী সন্ন্যাসিনীদের জন্য একটি মঠ স্থাপনাও স্বামীজীর বহু কাঙ্ক্ষিত ছিল। সারদা দেবীর মধ্যে ভারতীয় নারী আদর্শের পরমা মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন বলেই স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যা ভারতকন্যা নিবেদিতাকে—তাঁর পূর্ণ পরিণতির জন্য—শুদ্ধ ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে তাঁর নব জন্মান্তরের প্রয়োজনে—সর্বপ্রথমে সমর্পণ করেছিলেন অপরূপা মাতৃমূর্তি জগজ্জননী সারদা দেবীর চরণতলে। পরবর্তীকালে সারদা দেবীর মধ্যে নারী আদর্শের পূর্ণ প্রতিরূপ দেখে—বস্তুতঃ সারদা দেবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে থেকে—তাঁর সর্বসংস্কার-মুক্ত মন এবং সহজ অথচ বিচারশীল পূর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয় পেয়েই এই নিবেদিতা স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন: নারী জাতি সম্বন্ধে শ্রীমা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও প্রশ্ন রেখেছেন: তিনি কি প্রাচীন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি অথবা নূতন আদর্শের অগ্রদূত?

আমাদের সিদ্ধান্ত তিনি দুই-ই। একদিকে তাঁর চরিত্রে আমরা দেখেছি—ত্যাগ-তিতিক্ষা-ক্ষমা, করুণা-মাধুর্য-কোমলতা, ধৈর্য-সংযম-পরমতসহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতার মিশ্রণে শুচিশুভ্র তপস্বিনীর রূপ, কল্যাণশ্রীতে উদভাসিত আদর্শ মাতৃত্বের সকল গুণাবলী : অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ মাঙ্গল্যে বিধৃত সেই সব মানবিক অর্জনের আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য। আবার অন্যদিকে একালের উপযোগী একান্ত আধুনিক মন ও মনন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদ, বাস্তবতা বোধের সঙ্গে কবিত্ব ও কবিপ্রাণতা, প্রখর আত্মসম্মানবোধ ও স্বাবলম্বিতা, কর্মিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়চিত্ততা, স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতা, উদার সচ্ছল মানবিকতার সঙ্গে শিক্ষানুরাগ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা, কুসংস্কার ও প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সংগ্রামী চেতনা, নিসর্গপ্রিয়তা ও মানবপ্রেম এবং নতুনকে আবাহন ও গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং বিপরীত নানা তরঙ্গের বিরুদ্ধে মাথা-উঁচু পথ চলার সাহস ও নিষ্ঠা : এইসব গুণরাশিতেও নিবিড় অলঙ্কৃত তাঁর বিশাল বহুমুখী অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ পাশ্চাত্যেরও যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর ও মানবিক তাও সারদা দেবী গ্রহণ করেছিলেন উদার হস্তে। এইসব নানা বিপরীত গুণের সমাবেশে ও সমাহারে সারদা দেবীর চরিত্রে ঘটেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের একটি অপূর্ব আলোকিত সমন্বয়। এই মহান জীবনাদর্শের বিন্দুমাত্র উজ্জ্বল উত্তরাধিকার গ্রহণ করলে, শুধু ভারতীয় নারীসমাজই নয়, পরন্তু বিশ্বের সমগ্র নারী-জগৎই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে পূর্ণায়ত হয়ে উঠতে পারবে এবং শেষ পর্যন্ত পরিণামে অভিযাত্রী হতে পারবে পূর্ণের প্রাঙ্গণের অভিমুখে। এবং এ পথেই বিশ্ব-নারীর অন্বিষ্ট যথার্থ নারীমুক্তি ও নারী প্রগতি (women emancipation) একদিন সম্ভব হবে। বস্তুতঃ সারদা দেবীর মহৎ জীবন ও চরিত্র শুধু নারী সমাজের কাছেই প্রেরণাদায়ক নয়, আমরা সকলেই অনির্বচনীয় সেই মহাজীবনের নিরন্তর পবিত্র উৎসধারায় খুঁজে পাই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা, ব্যর্থতা-পরাজয়ের পরম সান্ত্বনা এবং এই জগৎ ও জীবন-জাত সকল ব্যাধির অমল শুশ্রূষা ও প্রসন্ন নিরাময়।

২৩

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তির আদর্শ সারদা দেবী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর দাম্পত্য জীবন

তাই মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্য থেকেই স্বামীজী সংগ্রহ করেছেন আধুনিক ভারতীয় নারীর অন্বিষ্ট আদর্শটি। নর-নারীর সম্পর্ক সমাজে কেমন হওয়া উচিত, বিভিন্ন সামাজিক পটভূমিকায় নারীর কর্তব্য, পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নারীর যোগাযোগ, নারীপ্রগতি ও নারী-মুক্তি-আন্দোলনের স্বরূপ ও তাৎপর্য, নারী-শিক্ষার মৌল ভিত্তি, কোন গুণাবলী, শুধু ভারতীয় নারীকে নয়—যে কোনো দেশের নারীকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সন্ধান দেবে : এ সব বিষয় সম্পর্কেই স্বামীজী তাঁর রচনা-বলীতে বারবার বলে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবনালেখ্য ছিল নারীমুক্তি সম্পর্কে স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনার একক গোমুখী-উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তির অর্থ তাই সমকালীন আত্মভ্রষ্ট পুরুষ-সমাজের অন্ধ অনুকরণে প্যাণ্ট-শার্ট পরে, সিগারেট মদ্য প্রভৃতি আরো সব বিচিত্র উন্মত্ত নেশায় আসক্ত হয়ে রাশছাড়া প্রবৃত্তির অন্ধকার পথে অসহায় আত্মসমর্পণ নয়। যথেচ্ছাচারিতা ও পশ্বাচারের সঙ্গেও যথার্থ নারী প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের একমাত্র আদর্শ। সত্যিকার শিক্ষার আলোকে আলোকিত পুরুষের সহজ সঙ্গিনী হয়ে মর্ত্যের এই জীবনযোজনার যৌথ দায়ভাগ সমভাবে গ্রহণ করা এবং গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কাঙ্ক্ষিত হলেও নারীকে পরিপূর্ণ নারীই হয়ে উঠতে হবে। পুরুষের জীবনের অন্ধ অনুকরণ নয়। তৎকালীন ভারতীয় নারীসমাজের দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-অপমান এবং তাদের অশিক্ষা, কুসংস্কার, অসহায় পরনির্ভরশীলতা প্রভৃতি দেখে, পাশ্চাত্যের নারীশক্তির স্বনির্ভর আত্ম-প্রকাশ—তাদের শিক্ষা-শক্তি-সাহস, তাদের কর্তব্যবোধ, কর্মতৎপরতা প্রভৃতি গুণাবলী আমাদের দেশের নারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হোক, স্বামীজী একান্তভাবে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নারীত্বের চিরন্তন উচ্চ-

আদর্শ—যা তিনি সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং গুরু-পত্নীর মধ্যে যার পরিপূর্ণ বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন—সেই অম্লান চরিত্র, সতীত্ব, শুদ্ধ প্রেমের প্রতি আজীবন আনুগত্য, ক্ষমা, ধৈর্য, তিতিক্ষা, লজ্জা, শালীনতা, লাবণ্যস্নিগ্ধ কোমলতা, দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতা, পরোপকারবৃত্তি—নারী প্রগতি ও নারীমুক্তির নামে এইসব গুণরাশি বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় নারী পাশ্চাত্য জীবনের তথাকথিত আধুনিকতার মোহে আচ্ছন্ন হোক—এ তিনি কখনো চান নি। ভারতীয় নারী তার অবলা, দুর্বলা, অকারণে অশ্রুপ্লুতা রূপ পরিত্যাগ করে কর্মতৎপর হয়ে, শিক্ষিত স্বনির্ভর হয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হোক, সবলা শক্তিময়ী সাহসী ও স্বাবলম্বী হোক,—কিন্তু স্বাধীনতার নামে কখনো চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা এসে তাদের যেন গ্রাস না করে। প্রাচীন রাজপুত নারীর তেজ-বীর্য-সাহস-আত্মসম্মানবোধ, তাঁদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মতো, রাণী দুর্গাবতীর মতো—এদেশের ঐতিহ্য অনুসরণ করে আগামী যুগের নারীজাতি বীরত্বে ও দৃঢ়তায়, চারিত্র-শক্তির প্রদীপ্ত প্রভায় পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জননীসুলভ বড় হৃদয়ের অধিকারও যেন তারা অর্জন করে। আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা করবে, একালের নানা বিদ্যায় বিদ্যাবতী হবে, আত্মনির্ভর হবে, কিন্তু ভারতের শাশ্বত ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা বিসর্জন দিয়ে নয়। কারণ আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। আদর্শ পত্নীর ভালবাসা ও নিষ্ঠা থাকবে স্বামীর প্রতি, বুকের মধ্যে অম্লান থাকবে সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর আদর্শ, আর বৃহৎ বিচিত্র এই জগৎ ও জীবনের মুখোমুখি হয়ে ক্রমে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে সর্বাঙ্গীণ আত্মপ্রকাশে দীপ্ত, সুদৃঢ় একটি বহুমুখী বিজয়ী ব্যক্তিত্ব। স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষুদ্রতা, কূপমণ্ডুকতা ও দুর্বলতার পরিবর্তে মহৎ হৃদয়, মহানুভবতা ও চারিত্র শক্তির অপাবৃতি প্রার্থনা করেছেন স্বামীজী ভারতীয় নারীর চরিত্রে। এবং যেসব গুণের সমাবেশে ভারতীয় নারীর তিলোত্তমারূপ নির্মাণে স্বামীজী প্রয়াসী হয়েছিলেন, সে সমস্ত গুণই সারদা দেবীর চরিত্রের থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

ভারতীয় নারী চরিত্রে যে গুণটির সবচেয়ে অভাব—সেই সাহস, শক্তি, নির্ভীক বলিষ্ঠতা ও স্বনির্ভরতা সারদা দেবীর মধ্যে ছিল পূর্ণমাত্রায়। সারদা দেবীর জীবনের অজস্র উদাহরণ থেকে এখানে মাত্র দু'চারটি উল্লেখ করছি। তেলো-

ভেলোর মাঠে অন্ধকার রাত্রিতে ডাকাতের সঙ্গে সারদা দেবীর মুখোমুখি হবার ঘটনা সকলেই জানেন। রাত্রির নিবিড় নিস্তব্ধতায় ঢাকা দিগন্ত-বিস্তীর্ণ সেই নির্জন মাঠের মাঝখানে প্রায় অশিক্ষিত ১৯/২০ বছরের এক গ্রাম্য তরুণী। তবু তাঁর সে কী সাহস, আত্মশক্তিতে কী প্রগাঢ় বিশ্বাস! লোড্‌শেডিং-এর অন্ধকারে কলকাতার রাস্তায় অতি উচ্চশিক্ষিত, বিলাতী খেতাবধারিণী অধ্যাপিকা বা ডাক্তার, জজ-ব্যারিস্টার কোনো মহিলাকে যদি টয়-পিস্তল হাতে নিয়ে পাড়ার কোনো মস্তান গুণ্ডা আক্রমণ করে—দেখা যাবে অশ্রুপ্লাবিত চোখে থর্‌থর্‌ করে তিনি কাঁপছেন, অথবা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছেন, কিংবা অতি দ্রুত পলায়মানা। আর শুধু নারীই বা কেন, উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকদেরও সেই একই দশা। অথচ অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে সারদা ডাকাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিন্তু একটিবারও কাঁপলেন না, সংজ্ঞা হারিয়ে মূর্ছিতও হলেন না, বা ভয়ে আর্তনাদ করে পালাতেও চেষ্টা করলেন না। নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মতো স্থির প্রত্যয়ে দুরূহ দুর্জয় ভীষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একান্ত আত্ম-বিশ্বাসের নম্রতা নিয়ে ডাকাতকেই পিতৃ-সম্বোধনে তার শরণ নিলেন: "বাবা, আমি তোমার মেয়ে সারদা,—দক্ষিণেশ্বরে তোমার জামাইয়ের কাছে যাচ্ছি। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি—আমায় একটু পথ দেখিয়ে দাও।" বিশ্বাস—আত্মবিশ্বাসের কাছে পরাজিত হল হিংসা, লোভ। পিতৃ-সম্বোধনের মধ্য দিয়ে বালিকা সারদা করাঘাত করলেন ডাকাতের ঘুমন্ত বিবেকের দরজায়, জাগিয়ে তুললেন তার হৃত মনুষ্যত্বকে। হিংস্র খুনী দস্যু ফিরে পেল তার হারানো সংবিৎ, বিলুপ্ত শুদ্ধ মনুষ্যত্ব। একালের দনুজদলনী জননী আমাদের এমনি করেই পদানত করলেন পশু-শক্তিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্ত হরিশের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কামারপুকুরে একদিন মাকে দেখে কুভাব জেগে ওঠে তার মনে। বাড়ীতে তখন আর কেউ নেই। নিরুপায় মা-সারদা ধানের মরাইয়ের চারদিকে ঘুরতে লাগলেন। হরিশ তবু কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। সাত বার মরাইয়ের চারদিকে ঘুরে বিরক্ত সারদা মা নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। রুখে দাঁড়িয়ে—ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন হরিশকে মাটিতে। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে অবিরাম চড় মারতে লাগলেন হরিশের গালে। হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল হরিশ। নিরঞ্জনানন্দ স্বামী

কামারপুকুরে এলে তাঁকে দেখেই হরিশ ভয়ে বৃন্দাবনে পালিয়ে গেল। পুরাণের পরিপ্রেক্ষায় ভক্তজনেরা এর যাই ব্যাখ্যা করুন, একালের সাধারণ মানুষ আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করি একান্ত আত্মনির্ভর, সাহস-শক্তিতে বলীয়ান অভীঃ-মন্ত্রের সাধনায় অভীক এক আশ্চর্য দুর্লভ বাঙালী বীরাঙ্গনার রূপচিত্র। "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দেবে অধিকার হে—বিধাতা!" আমরা এই কাহিনীর মধ্যে খুঁজে পাই বিশ্বকবির মহতী জীবন-জিজ্ঞাসার সার্থক সদুত্তর। এবং কবির এই কবিতা রচনার অনেক আগেই। আধুনিকতার, নারী প্রগতির, মনুষ্যত্বের এই উজ্জ্বল উত্তরাধিকার মা-সারদা রেখে গেছেন তাঁর সন্তানদের জন্য। কিন্তু আমরা নিতে পেরেছি তার কতটুকু?—

ভাষণে-ভূষণে, পোশাকে-পরিচ্ছদে কিংবা বহিরঙ্গ আচার-বিচার এবং প্রথানুগত্যের বা প্রথা-বিদ্রোহের মধ্যে প্রগতিবাদ নেই। যথার্থ প্রগতিবাদ মানুষের মুক্ত মানসিকতায়। বিপরীত তরঙ্গাবলীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের অধিকার অর্জন এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আত্মরক্ষার, আত্মপ্রকাশের ও বিকাশের ক্ষমতা লাভকেই যথার্থ প্রগতি আখ্যা দেয়া যায়। চেতনার গভীরে পরিপূর্ণ শক্তির উদ্বোধন ঘটানো হল প্রগতি বা মুক্তির সর্বাপেক্ষা জরুরী শর্ত। বিশ্বজগতের সমস্ত জীবকুলের ইতিহাসে এই বিচারে মানুষকেই বলা চলে সবচেয়ে প্রগতিবাদী আধুনিক। নখর-দন্ত নেই, শৃঙ্গ নেই, দাঁতে বিষ নেই, গায়ে শক্তিও বেশী নেই, তবু মানুষ এখনো বেঁচে আছে এবং সে অজস্র সংগ্রাম-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে পশু-জগতের অনেক উপরে। সে মরেনি। হারিয়ে যায়নি। জীবনের কোনো অবস্থায়ই এই না-মরা, হারিয়ে না-যাওয়াই নারী প্রগতি ও নারী মুক্তি-আন্দোলনেরও মূল কথা। মায়ের জীবনের নানা বিরুদ্ধ ও বিচিত্র পরিবেশের কথা চিন্তা করলেও মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিবাদিনী আধুনিকোত্তমা বলে অভিহিত করা যায়।

কর্মযোগিনী সারদা দেবীর অজেয় চারিত্রশক্তি এবং তাঁর সাহসিকতা ও নির্ভয়ের সাধনার প্রসঙ্গ ছাড়া আরো যে সব অজস্র মানবিক ও দৈবী গুণাবলীতে তাঁর চরিত্র ভূষিত ছিল, তা স্মরণ করলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। এক দিকে অন্যায়-অপরাধ-অমানবিকতার বিরুদ্ধে নিত্য

প্রতিবাদী সারদা দেবীর এক আশ্চর্য সংগ্রামী ভূমিকা, আবার অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে সমুত্থিতা, ধ্যান-সমাহিতা পবিত্রতাস্বরূপিণী, ক্ষমারূপা তপস্বিনী জগজ্জননীর প্রশান্ত রূপ—এ দুয়ের মাঝে কোথায় মিল আছে অনেক সময় আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। পরম বিস্ময়ে আমরা শুধু তাকিয়ে থাকি এই দেবী মানবী জগজ্জননীর দিকে। কিন্তু বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সারদা দেবীর অজস্র ভূমিকা দেখে আবার তাঁকে চিনতে অসুবিধে হয় না। কুসংস্কার, জাতিভেদ, প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে সারদা মায়ের যে সব সংগ্রামী ভূমিকা—বিভিন্ন জীবনী-গ্রন্থে অজস্র তাঁর কথা-কাহিনী ছড়িয়ে আছে—এখানে তার বেশী কিছু উল্লেখ করব না। তবু এ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে পড়ে সারদা মায়ের জীবনের নানা ঘটনা এবং তাঁর আশ্চর্য সব উক্তিসমূহ।

তুঁতে মুসলমান ডাকাত খুনী আমজদ খেতে বসেছে আর নলিনী দিদি উঠোনে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে পরিবেশন করছেন। তাই দেখে মা বললেন, "অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস, আমি দিচ্ছি" বলে মা-সারদা পাত্রে করে খাবার এনে নিজেই পরিবেশন করলেন এবং পরিতৃপ্ত করে আমজদকে খাওয়ালেন। এবং—খাওয়ার শেষে সারদা মা নিজেই উচ্ছিষ্ট স্থানটি ধুয়ে দিলেন। নলিনীদিদি তাই দেখে বললেন, "ও পিসীমা, তোমার জাত গেল!" এর প্রত্যুত্তরে মাতৃ-হৃদয় থেকে উৎসারিত অসাধারণ উক্তিটি সকলেরই মনে আছে: "আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।" উদ্বোধনের বাড়িতে মায়েরঃ কাকা নীলমাধব মুখুজ্জের মৃত্যুর পরে শববাহকদের মধ্যে একজন ছিলেন শূদ্র। অশাস্ত্রীয় এই ব্যাপারের প্রতি মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মায়ের সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবী উক্তি: "শুদ্দ্‌র কে, গোলাপ? ভক্তের কি কোনো জাত আছে?" "আমার ইচ্ছে হয় সকলকে এক পাত্রে বসিয়ে খাওয়াই। তা এ পোড়া দেশে জাতের আবার বড়াই আছে।"—এ দেশের জাতের বড়াই ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন বিশ্বজননী সারদা দেবী। জাতি-নির্বিশেষে সকল ভক্তকে ডেকে এনে একসঙ্গে বসিয়ে এক পাত্রে মুড়ি জিলিপি খাইয়েছিলেন সারদা দেবী। চোর তুঁতে মুসলমানের হাত থেকে তার ভক্তির দান কলা গ্রহণ করে তা দিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিতে সারদা দেবীর

কোনো সঙ্কোচ নেই। চোরের দেওয়া জিনিস ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হল কেন —জনৈক ভক্তের এই প্রতিবাদের উত্তরে সারদা দেবীর কণ্ঠে উচ্চারিত হল চিরকালের আধুনিকতার শ্রেষ্ঠতম বেদমন্ত্র : "কে ভালো, কে মন্দ আমি জানি।...দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কিন্তু কী করে যে তাকে ভালো করতে হবে তা জানে ক'জনে?" এবারে যে তিনি মন্দকে ভালো করতে, নীচুকে উঁচু করতে, পতিত অবনতকে উন্নত করতেই এসেছেন। এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের প্রয়োজনেই প্রবৃত্তিপরায়ণ নষ্ট যুবতীকেও তিনি আশ্রয় দিয়ে তাকে দীক্ষা দেন। মনুষ্যত্বের ঊর্ধ্বতম সোপানে তুলে দেবার জন্যে নানা অপরাধে অপরাধী বিপথগামী যুবক ভক্তকে অনায়াসে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে তুলে নিতে পারেন ক্ষমারূপা তপস্বিনী। পতিতের ভগবান এবারে পথের ধুলোয় নেমে এসেছেন। তাই ভিখারিণী মেয়ের দেওয়া উপহার পেয়ারা গ্রহণ করে খেতে কোনো সঙ্কোচ হয় না বিশ্ব-জননীর। যুগীর ছেলে ঢাকার পীতাম্বর নাথ হীন জাত বলে সারদা মায়ের কাছে আসতে তাঁর সঙ্কোচ। মা তার সব সঙ্কোচ হীনম্মন্যতা ভেঙে দিয়ে কাছে ডেকে নেন :—"কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে বসো।" রুগ্‌ণ সন্তানের আরোগ্য কামনায় অপরিচিত মেমসাহেব এলে সারদা দেবী তাঁকে অনায়াসে কাছে ডেকে নিতে পারেন। কাছে বসিয়ে তাঁর হাতে প্রসাদী ফুল ও প্রসাদ দিয়ে তাঁর সন্তানের মাথায় স্পর্শ করাতে বলতে কোনো দ্বিধা হয় না।(১) জগন্নাথক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সবার হাত থেকে খিচুড়ি-প্রসাদ ভাগ করে গ্রহণ করেছেন সারদা দেবী। আবার নিত্যকার ঠাকুর-পূজাব আগে ঠাকুরের জন্য উদ্দিষ্ট নৈবেদ্য তুলে দিচ্ছেন সারদা দেবী তেরো-চৌদ্দ বছরের একটি কিশোরের হাতে। সেবক বাধা দিলে সারদা দেবী বলছেন : "আঃ। বাছাকে খেতে দাও। প্রভু এর মধ্যেও আছেন।" আবার একদিন ঠাকুরের নিত্য ভোগের একবাটি দুধ পূজোর আগেই সারদা দেবী তুলে দিচ্ছেন সেবকের হাতে। সেবক আঁতকে ওঠেন। প্রতিবাদ করেন। "খাও বাছা, তোমার ভিতরেও ঠাকুর আছেন।"— সারদা দেবীর সহজ উক্তি। মহাষ্টমীর দিনে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে থাকা

(১) মায়ের আশীর্বাদে মেমসাহেবেব মেয়েটিব অসুখ ভালো হয়ে যায়। পরবর্তী-কালেও মেমসাহেবের মায়ের কাছে যাতায়াত ছিল এবং মায়ের কাছে দীক্ষাও নিয়েছিলেন।

তাজপুরের বাগ্দী ভক্তকে ঘরে নিয়ে এসে অঞ্জলির মন্ত্র পড়িয়ে দিচ্ছেন সারদা দেবী। মনে হয় এই যেন তাঁর আজন্ম কৃত্য : চিত্তকে যা ছোট করে, মনকে যা আবদ্ধ করে, তা কখনো ধর্ম হতে পারে না এবং তা মানুষের কাছে কখনো গ্রাহ্য নয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই উদার স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টির ফলেই অন্ধ কুসংস্কার, জাত-পাত, ছুঁৎমার্গ, দেশাচার ও যুক্তিহীন প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে পরমহংসের মতোই সারদা দেবীরও ছিল সংগ্রামী ভূমিকা। তলোয়ার ঘোরানো, ছুরি চালানো বা বন্দুক-বোমা-স্টেনগান্-ব্রেনগান-ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতির উদ্দাম প্রয়োগের মধ্যেই বিপ্লব আবদ্ধ নয়, পরন্তু যথার্থ বিপ্লব সম্পাদিত হয় মানসিকতার আমূল পরিবর্তনের শুদ্ধ প্রয়াসে। বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেই মানুষেব চিত্ত-চেতনায় ঘটে আমূল পরিবর্তন। রামকৃষ্ণ বিপ্লব মানুষের অন্তরে নিয়ে আসতে পেরেছিল এই পরিবর্তনের দুরন্ত জোয়ার—শুদ্ধ এক চৈতন্যের অধিবাসনার মাধ্যমে। পরিপূর্ণতার ফল-ফসল আজো আমরা তুলতে পারি নি জাতির সঞ্চয়-ভাণ্ডারে, কিন্তু পূর্ণের প্রত্যাশায় আমরা দিন গুণছি। কারণ, আমাদের সর্বাধিনায়কের ঘোষণায় আমরা জেনেছি—"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" কারণ, আমরা জানি বন্দুকের নল নয়, আত্মজয়ীর মনই সকল শক্তির একক ডায়নামো। কারণ, "ভারতের কার্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক—সে কাজ রণবাদ্য বা সৈন্যবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম ফুলগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।" জননী সারদা দেবী আমাদের ভারতবর্ষের এই শাশ্বত পথেরই একালের অভিযাত্রিণী এবং এদিক থেকে বিচার করলে সারদা দেবী ছিলেন অতুলনীয়া বিপ্লবী, শাশ্বত একালিনী এবং সর্বোত্তমা আধুনিকা।

ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা হয়েও পতিত দুঃখীর জন্য দুঃসহ বেদনায়,—আর্তের প্রতি অপরীসীম করুণায় প্রয়োজনে অব্রাহ্মণের হাতের তৈরী খাবার খেতেন সারদা দেবী। কতবার কায়স্থ রমণীকে স্পর্শ করে অন্ন গ্রহণ করেছেন। জাতিভেদ-প্রথা মানতেন না সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই। শুধু স্বদেশের বিভিন্ন জাতের নরনারীদের প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয় জননী সারদার এই বিচারনিষ্ঠ উদার সংস্কারহীনতা, এমন কি সাগরপারের বিদেশী ম্লেচ্ছদের সঙ্গেও ভ্রূক্ষেপহীন

সেই একই শুদ্ধ সহৃদয় মানবিক ব্যবহার। মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি স্বামীজীর ইওরোপীয় এবং আমেরিকান ভক্ত-শিষ্যাদের প্রথম দর্শনেই মা সারদা যে শুধু তাঁদের সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানালেন তাই নয়, কিংবা স্পর্শের আশীর্বাদে আতিথ্য দান মাত্র নয় সেই প্রথম দিনেই তাঁদের সঙ্গে তিনি এক পাত্রে আহার করলেন। অভাবনীয় এই ঘটনায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে: "ইউরোপীয় এবং আমেরিকান মহিলারা সেদিন মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তারপর কি কাণ্ড, ভাবতে পারো—মা তাঁদের সঙ্গে খেলেন পর্যন্ত। দারুণ ব্যাপার নয় কি?"—ভাতের হাঁড়ির, ছুঁৎমার্গী ধর্মের দেশে দারুণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। আর স্নেহের খুকি তো সারদা-মায়ের নিজেরই কন্যা—তাই তাঁর সঙ্গে সেই রকমই ব্যবহার করে গেছেন চিরকাল। সারদা-মায়ের অনুমতি নিয়ে নিবেদিতা একবার নিজের হাতে রান্না করে ভোগ নিবেদন করেছিলেন ঠাকুরকে। নিবেদিতার নিবেদিত সেই ভোগের প্রসাদ পরম আনন্দের সঙ্গে জগজ্জননী সারদা-মা আমাদের গ্রহণ করেছিলেন বলে শোনা যায়। এবং এ ব্যাপারে প্রতিবাদী গোঁড়া রক্ষণশীলদের মা নাকি জানিয়েছিলেন: নিবেদিতা তাঁর মেয়ে—ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার আছে তার। এবং এতে যদি কারো আপত্তি থাকে তো তাঁরা যেন দূরে থাকেন।—এরকম আরো কত ঘটনা। জয়রামবাটীতে অসুস্থ মা সারদা শুয়ে আছেন। "কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় ছিন্নবসন বিষণ্ণ-বদন আমজদকে"—মা সারদা ঘরের মধ্যে ডেকে এনে কথা বলেন, সান্ত্বনা দেন, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেন। অথচ সেই ঘরেই ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল। এবং সেই গঙ্গাজলেই ঠাকুরপূজা হয়। পথভ্রষ্ট মদ্যপ চরিত্রহীন পদ্মবিনোদকে মা সারদা তাঁর প্রার্থনায় গভীর রাত্রে উদ্বোধনের মায়ের বাড়ির জানালা থেকে দর্শন দেন। দুঃস্থ, অতি দরিদ্র এক স্ত্রীলোক ভক্তের শিক্ষিত পাগল ছেলে নিরুদ্দিষ্ট হলে তাঁর দুঃখে সমব্যথী সারদা-মায়ের বেদনার অন্ত থাকে না।

তবে শুধু করুণা নয়, ক্ষমা-সহানুভূতি-প্রীতির প্রস্রবণ নয়, সারদা-মায়ের চরিত্রে মাঝে মাঝে স্ফুরিত হতে দেখি ব্যক্তিত্বের নির্মম অশনি সঙ্কেত। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।"—চুরি করার অপরাধে স্বামীজী কর্তৃক মঠ থেকে বিতাড়িত উড়িয়া চাকরকে মা-সারদা তার দুঃখ-দারিদ্র্যের

কাহিনী শুনে পুনর্বহালের আদেশ দেন। এবং সে আদেশ স্বামীজীকে নিঃশব্দে মেনে নিতে হয়। প্রেমানন্দ স্বামীকে ডেকে বললেন মা: "দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের তাড়নায় ওরকম করেছে। তাই বলে নরেন ওকে গালমন্দ ক'রে তাড়িয়ে দিলে। সংসারে বড় জ্বালা; তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা তো তার কিছু বুঝবে না। একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" সম্রাজ্ঞীর মতো আদেশের ভঙ্গীতে পুনর্বার বললেন, "আমি বলছি, নিয়ে যাও।" অথচ—যা অন্যায়, অপরাধ, অমানবিক—তার প্রতিবাদ করতেও কখনো পরাঙ্মুখ হতেন না মা-সারদা। উদ্বোধনের বাড়ীর উল্টোদিকের বস্তিতে একবার একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ভীষণভাবে প্রহার করছিল। কিল-চড়, পরে লাথি। এবং মারের চোটে অবলা স্ত্রীলোকটি কোলের ছেলেকে নিয়ে উঠোনে গড়িয়ে পড়ল। মা আর থাকতে পারলেন না। জপ ফেলে বেরিয়ে এলেন এবং যাঁর কোমল কণ্ঠ কোনো দিন একতলা থেকে শোনা যেত না, সেই তিনি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পুরুষটিকে নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করে বললেন, "বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি? আঃ মলো যা।" ক্রোধোন্মত্ত লোকটা একবার মাতৃমূর্তি দর্শন মাত্র সাপের মাথায় ধুলো পড়ার মতো মাথা নীচু করে নির্যাতিতাকে ছেড়ে দিল। একবার এক রুগ্‌ণ স্বামীর মঙ্গলপ্রার্থী ধনীর গৃহিণীর জাঁকজমকপূর্ণ সাজ-পোশাক, বিলাসিতা ও প্রসাধনচর্চিত মুখমণ্ডল দেখে মা-সারদা প্রকাশ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করেন। আবার গেরুয়া পরিহিতা একটি কুমারী মেয়ে মাকে প্রণাম করতে এলে সারদা মা যখন জানলেন যে সন্ন্যাস না নিয়েও মেয়েটি গেরুয়া পরে গেরুয়া কাপড়ের মর্যাদা নষ্ট করেছে, মা-সারদা তখনই তাকে তার হঠকারিতার জন্য তিরস্কার করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

কোনো কারণে কারো কাছে মাথা নোয়ান নি সারদা মা। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উপদেশ: "তুমি কামারপুকুরে থাকবে; শাক বুনবে—শাকভাত খাবে—…কিন্তু কারো কাছে একটি পয়সার জন্য চিৎহাত করো না।" মা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন স্বামীর উপদেশ। তাঁর উঁচু মাথা কারো কাছে কোনো দিন নোয়ান নি। তাই রামলালদাদা ও খাজাঞ্চীর পরামর্শে রানী রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস যখন সারদা মায়ের মাসোহারা বন্ধ করে

দিলেন, মা সারদা এ সম্পর্কে একটিও আফসোসের বাক্য উচ্চারণ করলেন না। আবার অন্য দিকে দেখা যায় খাপখোলা তলোয়ারের মতোই ঝল্সে উঠছে সারদা মায়ের প্রখর ব্যক্তিত্বের আগ্নেয় দীপ্তি। রাজেন্দ্রাণীর মতোই আদেশ দিচ্ছেন, শাসন করছেন সঙ্ঘের সন্তানদের এবং অন্যান্যদেরও। এবং প্রয়োজনে বিধাতার মতো নির্মম রুদ্র-কঠোর হতে জানতেন সারদা মা। কী অপরাধে বেশ কিছুকালের জন্য মাধুকরী ভিক্ষান্নে প্রাণ ধারণের কঠিন শাস্তি দিয়েছেন মা এক ব্রহ্মচারীকে। এবং তৎক্ষণাৎ আদেশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্রহ্মচারীকে আশ্রম পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল। আবার শোনা যায়—সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবন-চর্যা লঙ্ঘনকারী সাধুকে মা-সারদা চিরতরে তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নির্বাসন দিতেন। সারদা-মার সম্মুখে তাঁদের আসারই হুকুম ছিল না। একবার কোয়ালপাড়া মঠে কাজকর্ম নিয়ে সেবকদের সঙ্গে অধ্যক্ষের ঘটে মতবিরোধ। আশ্রমের সেবকরা যাতে অন্য কোথাও না যেতে পারে তার জন্য অধ্যক্ষ মহারাজ সারদা মাকে ইঙ্গিতে অনুরোধ করতেই তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন: "তুমি আমাকে দিয়ে কী বলিয়ে নিতে চাও? আমি বুঝি বলে দেব যাতে ওরা কোথাও থাকতে না পারে?…একথা আমি বলতে পারব না।" সারদা মায়ের সেই ক্রোধ-কঠিন কণ্ঠস্বরে, ভয়ঙ্করী আগ্নেয় রূপের সম্মুখে সকলেই ভয়ে অস্থির। মঠাধ্যক্ষ তখন সারদা মায়ের পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মা, ক্ষমা করুন।" এবং মা-সারদা তৎক্ষণাৎ একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন। বেলুড়মঠে এক সাধুর চাকরকে চড় মারা নিয়ে সাধুদের উদ্দেশে সারদা মায়ের তিরস্কার-তীক্ষ্ণ নির্মম উক্তিগুলিও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। "তোমরা তো সন্ন্যাসী, তোমাদের ত্যাগই লক্ষ্য; একটা চাকরকে তোমরা ত্যাগ করতে পার না?" "তোমরা তো সন্ন্যাসী, গাছতলায় থাকবে, তোমাদের আবার মঠ বাড়ি চাকর—,আবার সে চাকরকে মার।" প্রসন্ন বরাভয় মুদ্রায় আসীনা দক্ষিণমুখ করুণাময়ী জননী রূপই তাঁর একমাত্র সত্য পরিচয় নয়, তিনি যে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরিচালিকা, সঙ্ঘপ্রধানা—তাঁর এই মহান দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি কখনও বিস্মৃত হন নি। হননি বলেই কুসুমের মতো কোমলতার সঙ্গে এমন করে তাঁর মহান চরিত্রে সমন্বিত হতে পেরেছিল বজ্রের কঠোরতা।

সারদা মা বলতেন, "অপচয় করতে নেই।" যথার্থ ত্যাগ মনে—, মানসি-

কতায়। বহিরঙ্গ আচারে অনুষ্ঠানে বা চর্যায় নয়। তাই গৃহস্থকে মা সঞ্চয়ের উপদেশ দিতেন এবং কারুরই এলোমেলো অকারণ খরচ দেখতে পারতেন না। একবার জ্ঞান মহারাজ খাঁটি দুধ পাঠিয়েছেন জয়রামবাটীতে। দুধের ঘড়ার মধ্যে দেখা গেল একটি ছোট্ট মৌরলা মাছ। সবার মনে হল এ অপবিত্র দুধে ঠাকুরের ভোগ হবে না। এ দুধ ফেলে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন আশ্রমের সকলে। কিন্তু : "ফেলবে কেন? —গোয়ালারা দুধে কি না মেশায়, অথচ সেই দুধের তৈরী মিষ্টিতেই তো ঠাকুরের ভোগ দেয়া হয়। তাছাড়া পুকুরের জলেও তো মাছ থাকে। সে জল কি আমরা ব্যবহার করি না?" নলিনী-দিদির এই যুক্তি গ্রহণ করে মা-সারদা ফেলে দিলেন না সে দুধ। ঐ দুধেই পায়েস রান্না করে সারদা মা ভোগ দিয়েছিলেন ঠাকুরকে (মতান্তরে, ছেলে-মেয়ে ভক্তদের খাইয়েছিলেন)। অর্থ ও অলঙ্কার সম্পর্কেও সারদা মায়ের ধারণা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় একটু অন্য রকম। অর্থাদির প্রতি সারদা মায়ের শ্রদ্ধা ছিল কারণ অর্থ লক্ষ্মীর প্রতীক। তাই মাথায় ছোঁয়াতেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, কোনো আসক্তি ছিল না। এর নামই বিশুদ্ধ কর্মযোগ। আবার কোনো জিনিস নষ্ট করাও পছন্দ করতেন না। বলরামবাবুর বাড়ি থেকে চুপড়িতে করে অনেক আতা এসেছে। ঠাকুরঘরে আতাগুলি রেখে সেবক চুপড়িটি বাইরে ফেলে দিলেন। সারদা মা দেখলেন চুপড়িটি সুন্দর এবং কাজে লাগতে পারে। মা-সারদা তাই চুপড়িটি আনিয়ে ধুয়ে মুছে রেখে দিলেন। কোনো ভক্তের দেওয়া ভুনিখিচুড়ি বালক রামময় মহারাজ পাতে ফেলে রেখে গেলে মা বলেছিলেন, "এমন ভালো জিনিস ফেলো না।" পাশের বাড়ীর দুঃস্থ সদ্গোপ মেয়েটিকে ডেকে মা সেই খিচুড়ি দিয়ে দিলেন। এমন কি তরকারির খোসাগুলি পর্যন্ত তুলে রেখে গরুকে খাওয়াতেন। বলতেন, "যার যেটি প্রাপ্য সেটি তাকে দিতে হয়।"—কিন্তু সারদা মায়ের এই উজ্জ্বল উত্তরাধিকার আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। আজো দেশের চরম অভাবের দুর্দিনে বাঙালীরা তাদের উৎসবকে কেন্দ্র করে যে অর্থহীন অপচয়ের বন্যা বইয়ে দেয়—তা যে কোনো সভ্য সৎ মানুষের কাছে অকল্পনীয়। এবং চূড়ান্ত এক সামাজিক ও মানবিক অপরাধ। মার্জনাহীন মহাপাপ। অথচ মা-সারদা এদেশেই জন্মেছিলেন। আমাদেরই একজন হয়ে।

—বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রণাম করার শুভ সংস্কার সারদা-মা মানতেন। তাই বৈদ্য

শ্যামাদাস কবিরাজকে প্রণাম করতে নির্দেশ দিতেন রাধু প্রভৃতিকে। "প্রণাম করবে না। কত বড় বিজ্ঞ; ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য—" এই হল সারদামায়ের যুক্তি। শ্রমের মর্যাদা দিতেও কোনো কার্পণ্য ছিল না সারদা মায়ের। তাই রাঁধুনী ব্রাহ্মণীকে মা-সারদা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। ভানুপিসী, ক্ষীরোদবালা ও অন্যান্য কায়স্থ ভক্তদেরও রাধু প্রভৃতিকে প্রণাম জানাতে বলতেন। কারণ ভক্তের কোনো জাত নেই। যথার্থ এবং বৃহত্তর অর্থেই মা-সারদা ছিলেন সর্বসংস্কারবিমুক্ত মানবতার পূজারী।—আহারাদি সম্পর্কেও মা-সারদা কঠোরতা পছন্দ করতেন না। বিধবাদের মা রাত্রে রুটি-পরটা খেতে বলতেন। যোগীন-মা'র বিধবা খুড়ীমাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্জলা একাদশী ভঙ্গ করান। সারদা-মা-ও দীক্ষা-গ্রহণেচ্ছু বালবিধবা ক্ষীরোদবালাকে খাবার ব্যাপারে কঠোরতা না করতে উপদেশ দিতেন: "বাছা, অনেক কঠোরতা করেছ; আমি বলছি আর কোর না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলেছ। দেহ নষ্ট হলে কী নিয়ে ভজন করবে মা?" এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই আর্ষোক্তি: খালি পেটে ধর্ম হয় না। বালবিধবা শবাসনা দেবীকে নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখে মা-সারদা বলছেন: "আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কী হবে? আমি বলছি তুই জল খা!" ভক্ত সুরবালা দেবী স্বামীর মৃত্যুর পর বাকী জীবন হবিষ্যান্ন গ্রহণে কাটিয়ে দেবার প্রস্তাব করলে মা-সারদা বলছেন, "আত্মা যদি কিছু খেতে চায়—আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়; সে কাঁদে, আমাকে দিলে না বলে।" শুষ্ক হৃদয়হীন যান্ত্রিকতায় পালিত বাহ্যিক কোনো আচার-অনুষ্ঠান সারদা-মা পছন্দ করতেন না। তাই ভক্তদের বলতেন, "খেয়েদেয়ে দেহটা ঠাণ্ডা করে নিয়ে ভগবানকে ডাকো"।—খাবার দাবার ব্যাপারে কোনো অযথা অনুশাসন সারদা-মা বা শ্রীরামকৃষ্ণ কেউই মানতে পারতেন না। সারদা-মা বলতেন, "আমার ছেলেরা নিরামিষ খাবে কেন?…খুব খাবে দাবে আর ফুর্তি করবে। যা প্রাণে চায় তাই খাবে, বাকিটা আমি দেখব।" কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুরকে সিদ্ধ চালের ভাত ও মাছভোগের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন সারদা-মা। অন্ততঃ প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে। তিন তরকারি ছাড়া ভোগ হবে না—এও মায়ের নির্দেশ। উদ্দেশ্য তাঁর আশ্রমের ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা। তাদের যে জয়ী হতে হবে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তাই এই জীবনদায়িনী পথ-নির্দেশ।

ভক্তদের প্রসাদ দেবার প্রয়োজনে একবার আহারের পর পুনর্বাব অন্নগ্রহণেও সারদামায়ের কোনো আপত্তি নেই। অন্ধ সংস্কারের বন্ধন নেই। সর্ববন্ধনবিমুক্তা জগজ্জননী ভক্তদের সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গের মতো ব্যবহার করতেন। বাইরের লোক-দেখানো গুরুগিরি বা জোর করে শ্রদ্ধা আদায় কোনোটাই: সারদা-মা পছন্দ করতেন না। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া-শোওয়া, কথা-গল্প-পরিহাস—সবই চলত সঙ্গী-ভক্ত-শিষ্যাদের সঙ্গে। কোথাও কোনো বাধা-বন্ধন ছিল না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেব ঘরে জন্মগ্রহণ করেও—অল্পবয়সী বিধবা মেয়েদের গহনা পবার, মাছ খাবার নির্দেশ দিতে পর্যন্ত সারদা-মা কুণ্ঠিত হতেন না। কারণ তিনি জানতেন জীবন অনেক বড। প্রাণকে আপন নিয়মে বেড়ে উঠতে দিতে হয়। কারণ, "ওদের আকাঙ্ক্ষা থাকে কি না। না হলে চুরি করে খাবে। যখন বুঝতে পারবে এটা সমাজবিরুদ্ধ, তখন আপনিই ছেড়ে দেবে।" কোনো আইন বা সমাজ বা নীতিশাস্ত্রের অনুশাসনে প্রবৃত্তিকে স্তব্ধ করে দেয়া যায় না। জোর করে ছড়ি ঘুরিয়ে সংযম শেখানো সম্ভব নয়—এসব কথা মা জানতেন। তাই স্বীয় সন্তানদের চরিত্র ও প্রবণতা লক্ষ্য করে—অনেককেই বিয়ে করার পরামর্শ দিতেন।—শ্রীরামকৃষ্ণ মানসিক গডন দেখে ভক্তদের অনেককেই গৃহস্থ হতে নির্দেশ দিতেন। যখন যেমন তখন তেমন। যার যেমন তার তেমন। তাছাডা তিনি যে সতেরও মা, অসতেরও মা।—তাই তাঁর স্নেহ-বিগলিত করুণাধারা জাতি-ধর্ম, উচ্চ-নীচ, ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ নির্বিচারে উদার মৌসুমীব মতোই সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হত। এমন কি নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে যে সম্পর্ক সর্বজননিন্দিত সেই উপপত্নীর সেবারত শ্রমিক পুরুষেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাতে মা-সারদা কার্পণ্য করেন নি। সারদামায়ের বাড়ীর সামনের বস্তিতে পীড়িত উপপত্নীকে আপ্রাণ সেবায় শুশ্রূষায় সারিয়ে তুলতে দেখে মা মুগ্ধ হয়ে যান। "কী সেবাটাই করেছে মা—এমন দেখিনি। একেই বলে সেবা—একেই বলে টান"—বলে মা-সারদা পুরুষটার কত সুখ্যাতি করেছেন কতজনের কাছে। অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে উপপত্নীকে সেবার কোনো মূল্যই নেই আমাদের কাছে। বরং বিগর্হিত অপরাধ বিবেচিত হবে। সারদা-মার মধ্যে ছিল এই সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মানবিক দৃষ্টি। নিজে সব দুর্বলতার ঊর্ধ্বে থেকেও মানুষের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতেন।

সমাজে সবচেয়ে যারা অসহায়, দুর্বল আর্ত আর সকলের ঘৃণিত-নিন্দিত-উপেক্ষিত, তাদের প্রতিও নয়, তাদের প্রতিই যেন মায়ের সবটুকু ভালোবাসা—সব স্নেহ! "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন/সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে/সবার পিছে, সবার নীচে,/সব-হারাদের মাঝে।" পূর্বজীবনে বারবনিতা এক বৃদ্ধা দক্ষিণেশ্বরে নহবতে আসতেন মায়ের কাছে। অতি আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে সারদা-মা তাঁকে আপনার করে নিয়েছিলেন। পূর্বজীবনে শুচিশুভ্র ছিলেন না—এরকম এক ভক্ত রমণী সারদামা'র হাত থেকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্ন পরিবেশন করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং ওর হাতে ভবিষ্যতে অন্ন পাঠাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামাকে নিষেধ করে দেন। কিন্তু অপমানিতার জননী তার প্রত্যুত্তরে বলেন: "তাতো আমি পারব নি ঠাকুর, 'মা' বললে তো থাকতে পারব নি।" সৎ অসৎ সকলের প্রতি উৎসারিত তাঁর অমল মাতৃত্বের উৎসধারা। সার্বিক কল্যাণবোধে এবং সকলেব—সমস্ত সমাজের মঙ্গল-চেতনায় সদা-জাগ্রত ছিলেন বলেই কোনো এক ভক্তিমতী ভক্ত রমণী তাঁর চিকিৎসকস্বামীর পসার কামনায় মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে, মা তাঁর সে অন্যায় প্রার্থনা পূরণ করতে পারবেন না বলে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। কারণ চিকিৎসকের পসার মানেই তো আরো বহু লোকের রোগ ভোগ এবং:ক্লেশ যন্ত্রণা। সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপিণী, সর্বার্তিহারিণী সকলে দুঃখনাশিনী বিশ্বজননী হয়ে তা কী করে মেনে নেবেন এই অন্যায় আবদার? সর্বাস্তিবাদে ও বিশ্বৈক্যবোধে সমন্বিত সমাজতন্ত্রের এই হল যথার্থ রূপ।

সারদা-মায়ের প্রগতিবাদ ও নব জীবনযোজনার নানা প্রকল্প বিধৃত হয়ে আছে তাঁর অসাধারণ এক সার্বিক জীবন-প্রত্যয় ও পরিব্যাপ্ত মর্ত্যপ্রীতির সঙ্গে। অথচ তা সব সময়েই বিজ্ঞান-চেতনায় দীপ্তিমান ও যুক্তি-নিষ্ঠায় সুদৃঢ়। তাই সারদা-মা-ই বলতে পারেন: "উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না।" আবার বলছেন:—আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য অবশ্যই গুরুর সব কথা মানতে হবে। কিন্তু ঐহিক বিষয়ে শ্রেয়বোধে স্থিত হয়ে নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধি অনুযায়ী কৃত কর্ম, গুরুর অনুমোদন লাভ না করলেও, তাই হবে গুরুর উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি, গুরুর সর্বোত্তম সেবা করা। এক স্ত্রীভক্ত মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলে মা বলছেন, "বে দিতে না পারো, এত ভাবনা করে কী হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও।

লেখা-পড়া শিখবে, বেশ থাকবে।" মেয়েদের লেখা-পড়া শিখে স্বাবলম্বী হওয়া, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি বিষয় মেয়েরা পড়ুক—এ সবই তিনি সমর্থন করতেন। নিজের যেমন তীব্র জ্ঞানস্পৃহা ছিল, তেমনি তিনি ছিলেন নারীশিক্ষার প্রবল সমর্থক। সারদামায়ের উদার সংস্কৃতিসচ্ছল প্রগতিবাদী মন ও মননের জন্যই তিনি কখনো নতুনকে স্বাগত জানাতে, অজানাকে গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করতেন না। যা কিছু শুভ্র, সুন্দর ও কল্যাণপ্রদ তা গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হতেন না। নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর ভক্ত শিষ্যা ইওরোপীয় ও আমেরিকান মহিলাদের তিনি প্রথম দর্শনেই যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন সে প্রসঙ্গ আগেই উল্লিখিত হয়েছে। বিদেশিনীদের আদবকায়দার অনুসরণ করতে তিনি এগিয়ে আসতেন। মেমসাহেব ও অন্যান্য প্রদেশের ভক্তদের ভাষা না বুঝলেও তিনি তাঁদের অতি সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতেন। মেম-ভক্তদের অনেক সময় ইউরোপীয় প্রথায় করমর্দনের ভঙ্গিতে তিনি তাঁদের হাত ধরে নিজের কাছে বসাতেন। শ্রীমতী ওলি বুলের মিনতিতে সাহেব ফটোগ্রাফারদের সম্মুখে তাঁর উপস্থিতি, ঈস্টার উৎসবে নিবেদিতার কণ্ঠে খ্রীষ্টীয় ধর্ম সঙ্গীত শুনে মায়ের ভাবসমাধি—এ সবই স্মরণীয়। বিদেশিনী ম্লেচ্ছ মেমসাহেব নিবেদিতা ও কৃস্টিনের সঙ্গে তাঁর সহৃদয় আত্মীয়সম্পর্কের কথা মনে পড়ে। আর কন্যা নিবেদিতার সঙ্গে তিনি তো একসঙ্গে থাকতেন-খেতেন-শুতেন-ঘুমাতেন। নিবেদিতার প্রতি কর্মপ্রয়াসের পশ্চাতে ছিল তাঁর অভয়বাণী, সঞ্জীবনী মন্ত্র, তাঁর আশীর্বাদ। এই হলেন আমাদের মা সারদা।

একদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিবাদ, অন্যদিকে সকলের সঙ্গে স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ, এই দুইয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। তিনি বলতেন, "সর্বদা বিচার করবে।" বলতেন, "খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়!" আবার বলতেন: "কাজই লক্ষ্মী, কাজে দেহ মন ভালো থাকে, একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।" জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না তিনি। তাই দেখা যায় সর্বত্যাগী তপস্বিনী হয়েও পরিবার-পরিকল্পনার স্বপক্ষে কথা বলে গেছেন মা সারদা। মানবমনস্তত্ত্বের অভ্রান্ত অনুশাসন মেনে তিনি সকলকে অবাধ স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। "যা প্রাণে চায় করে যাও—আমি তো আছিই।"

—এই ছিল সন্তানদের কাছে তাঁর অপার স্নেহের আশ্বাসবাণী! গ্রহণের মধ্য দিয়ে বর্জন, ভোগের মধ্য দিয়ে ত্যাগ, এই ছিল সাধারণের জন্য তাঁর জীবনবাণী। উচ্ছেদের পথে নয়, প্রবৃত্তির উদ্‌গতির মধ্য দিয়েই আমাদের মৌল আন্তর সত্তাটিকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে হবে। সার্বজন্য সুধার সন্ধানে সার্বিক এক জীবন-সাধনাসিদ্ধির কথাই তিনি বলে গেছেন। "যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দিতে হবে", কিংবা—"কাউকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে নেই" প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি তাঁর কণ্ঠে বহুবার আমরা শুনেছি। অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত নির্মম হুঁশিয়ারি—"না বুঝে আগুনে হাত দিলেও হাত পোড়ে।" ধর্মের নামে যে প্রচলিত রোমান্স-কাহিনী এবং অলৌকিকতার অবাস্তব অসম্ভব নানা ধূম্রজাল—তিনি তা সব সময়ই ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "ভগবান পেলে আর কী হয়? দুটো শিং বেরোয়? তা তো নয়। তাঁকে পেলে মন শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ মনে ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ হয়।" আবার অন্যত্র বলেছেন: "ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? দুটো শিং বেরোয়?...না, সদসৎ বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়। ভাবে লাভ—এছাড়া কে ভগবান দেখেছে, কার সঙ্গে ভগবান কথা কয়েছেন? ভাবে দর্শন, ভাবে কথাবার্তা, সব ভাবে হয়।" বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গেও সারদামায়ের যুক্তি-সমৃদ্ধ আধুনিক ব্যাখ্যা আমাদের বিস্মিত করে। বেদান্তের অতি উচ্চ দার্শনিক চিন্তাসমূহকেও তিনি অতি সহজ সরলভাবে প্রকাশ করেছেন এবং আধুনিক জীবনের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করে গেছেন।

তাঁর বিজ্ঞানচেতনার ও যুক্তিবাদের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করছি: স্বামীজী কাশ্মীর থেকে অসুস্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে সারদামাকে এসেছেন প্রণাম করতে বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে। এবং এসেই অভিযোগ: "মা, এই তোমার ঠাকুর! কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত বলে ফকির আমায় অভিশাপ দিলে—'তিন দিনের মধ্যে উদরাময় হয়ে ওকে চলে যেতে হবে!'—আর কিনা তাই হল—আমি পালিয়ে আসতে পথ পেলুম না! তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না।" —তার উত্তরে মা বললেন, "বিদ্যা, বিদ্যা মানতে হয় বৈকি বাবা। সব বিদ্যাই বিদ্যা—ওঁরা তো ভাঙতে আসেন না।......শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই নিজের শরীরে ব্যাধি আসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জানো খুড়ভুত

দাদার (হলধারীর) অভিসম্পাতে ঠাকুরের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে অসুখ আসা একই কথা।"—মায়ের এই বিজ্ঞান-ভাস্বর যুক্তিনিষ্ঠ উত্তর শুনে স্বামীজীর চোখ জলে ভরে গেল। মনে পড়ল তিনিই না কত জায়গায় বক্তৃতায় বলেছেন: "সৃষ্টির এলাকা নিয়মের এলাকা; নিয়মের মধ্য দিয়াই নিয়মাতীত রাজ্যে যাইবার পথ, আমাদের দেহ-মন নিয়মে বাঁধা।" স্বামীজী দুহাতে সারদা-মায়ের পা জড়িয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকলেন; তারপর নীচে নেমে এলেন। তাঁর বিজ্ঞান-বিধৃত যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য শুনে বিবেকানন্দের মতো দিগ্বিজয়ী মহাজ্ঞানী মহাপুরুষও মায়ের পদতলে শিশুর মতো হয়ে গেলেন। এই হল জগজ্জননী সারদার আর এক অসাধারণ রূপ। এই বিজ্ঞান-বোধ ও যুক্তিবুদ্ধির আলোকেই তিনি বহুবিধ মতানৈক্যের ও দ্বন্দ্বের সমাধানে একটি স্থায়ী ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। তাই তাঁর কাছে এলে সকলেই সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসানে একটি দ্বন্দ্বাতীত গগনসদৃশ সর্বধীসাক্ষীভূত মাতৃরূপা জ্ঞানমূর্তির সন্ধান পেতেন। অনেকের মতে "জ্ঞানরূপা সেই মাতৃমূর্তিটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ সমাজের নারী-প্রকৃতির স্বরূপাদর্শ।" বস্তুতঃ তিনি যেন সর্বসমন্বয়ের একটি ঘনীভূত রূপ। একই সঙ্গে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের, প্রাচীনতার ও আধুনিকতার, শক্তির ও বিনয়ের, কর্মের ও ধ্যানের, ত্যাগের ও ভোগের, ভক্তির ও বিপ্লবের, জাতীয়তার ও আন্তর্জাতিকতার, জীবন ও মহাজীবনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে ও বাণীতে। একদিকে বিজ্ঞানদৃষ্টি ও যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তববাদ, আবার অন্য দিকে দেখতে পাই সৌন্দর্যবোধ, নিসর্গপ্রিয়তা, কবিদৃষ্টি, ও শিল্পচেতনার অদ্ভুত সমাহার। তাই প্রেমানন্দজী মহারাজ যথার্থ ই বলেছেন:—"মাকে বুঝতে পারা খুব সহজ সাধ্য নয়।"—সারদা-মার চরিত্রে এত সব গুণরাশির সমন্বয় দেখেই নিবেদিতাও বললেন: "আমার ধারণায় সারদা দেবী বর্তমান পৃথিবীর মহোত্তমা নারী।" বললেন: "সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি…সত্য সহধর্মিণী,"—"শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণ করার উপযুক্ত পাত্র"। তাঁর নিজের ধ্রুবমন্দির এবং ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের চরম বাণী, সারদা দেবীর সমগ্র জীবন তাঁর কাছে মনে হত এক দীর্ঘ নীরব প্রার্থনার মতো। যথার্থ ই শ্রীমা ছিলেন প্রজ্ঞা ও মাধুর্যের সমন্বয়ে সরলতম নারী।

স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই একই সঙ্গে এই বিজ্ঞান-দৃষ্টি, সৌন্দর্যচেতনা, নিসর্গানুভূতি, কবিত্বভাব ও শিল্পবোধের সমন্বয় ও সমাহারের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে দেবী-সারদার মধ্যেও একটি অখণ্ড উজ্জ্বল পরিপূর্ণ মানবতা। কালো মৌসুমী মেঘে ঢাকা আকাশের প্রেক্ষাপটে উড়ন্ত বলাকার সারি দেখে সৌন্দর্য ও নিসর্গচেতনার অতলান্ত গভীরতায় ডুবে গিয়ে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের হয়েছিল ভাবসমাধি। আর জননী সারদা জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রিতে পূর্ণ চাঁদের দিকে চেয়ে প্রার্থনা-প্রণত হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, "তোমার ঐ জ্যোৎস্নার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।" অবাক সৌন্দর্যবোধে তন্ময় হয়ে মাকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকতে দেখি জ্যোৎস্না-প্লাবিত বহতা ভরা গঙ্গার দিকে মুখ করে। কোয়ালপাড়ায় ঝড় ও শিলাবৃষ্টির দিনে মাকে দেখি প্রাণশক্তিতে ভরপুর চপল চঞ্চল বালিকার মতো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শিল কুড়োচ্ছেন। আবার আমাদের মনে পড়ে রামেশ্বর দর্শনের যাত্রা পথে খুর্দা-রোডের পরে গাড়ী থেকে চিল্কা হ্রদ দেখে মা সারদার শিশুর মতো আনন্দবিহ্বল রূপটি। উভয়ের জীবনেই এরকম নিসর্গ ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। এবং এই সৌন্দর্যের অভিস্নানে অভিষিক্ত হয়েই—স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ভিতরেই মাঝে মাঝে আবির্ভূত হত আশ্চর্য এক কবি-প্রতিভা। তিনি যখন বলেন, "ভালোবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়"—তখন কি মনে হয় না আধুনিক কোনো কবিতা পড়ছি? কিংবা বিবাহ প্রসঙ্গে মায়ের সেই অসাধারণ কাব্যোক্তি: "সংসারে সবই দুটি দুটি। এই দেখ না চোখ দুটি, কান দুটি, হাত দুটি, পা দুটি—তেমনি পুরুষ প্রকৃতি।" সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ইংরেজ কবি শেলীর সেই অসাধারণ কবিতাটি: 'The fountains mingle with river'!

"The fountains mingle with the river,
And the rivers with the ocean,
The winds of Heaven mix for ever
With a sweet emotion;
Nothing in the world is single;
All things by a law divine
In one spirit meet and mingle.
Why not I with thine?"

মানবচরিত্র সম্পর্কেও ছিল উভয়ের অসাধারণ প্রজ্ঞা। কথামৃতের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকজীবন এবং মানবচরিত্র সম্পর্কে অসীম জ্ঞানের পরিচয়। একবার দেখে, একটি দুটি কথা বলেই তিনি লোক চিনতে পারতেন। সমগ্র মানুষটার ভিতরটা—তার সু-কু, ভালো-মন্দ নিয়ে কাচের আলমারির মতো তাঁর কাছে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত। মায়েরও ছিল এই ক্ষমতা। তাই নিজের সন্তানদের সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে আধুনিক মনস্তত্ত্বের ও মনোবিদ্যার শেষ কথাট মায়ের পক্ষেই এভাবে প্রকাশ করা সম্ভব: "মনের বাসনা-কামনা যা যা আছে পূর্ণ করে নাও"—কিংবা "যে যা খুশী করো না কেন, যে ভাবে খুশী চলো না কেন......ঈশ্বর হাত-পা-ইন্দ্রিয়াদি দিয়েছেন, তারা তো ছুটবেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই"—কিংবা "যা প্রাণে আসে করে যাও"—ইত্যাদি। আবার বলছেন, "অবিশ্বাস তো আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এরকম করেই তো বিশ্বাস হয়। এই রকম হতে হতে পাকা বিশ্বাস হয়।" কিংবা মা সাবদা যখন আশ্রমের কর্ম-পরিচালক সন্ন্যাসীদের উপদেশ দিয়ে বলেন: "দেখ সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।" "কাউকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই।" কিংবা, "যা কিছু করো না কেন—সকলকে নিয়ে, সকলকে একটু মান দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বৈকি। একটু আল্‌গা দিয়ে সব দিক দূর থেকে লক্ষ্য করতে হয়—যাতে বেশী কিছু খারাপ না হয়।" এই সব বাক্যাবলী পড়লে মনে হয় কোনো বিশেষজ্ঞের লেখা 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট'-এর পৃষ্ঠা ওলটাচ্ছি—কিংবা আধুনিক কল-কারখানায় শ্রমিক-মালিকের মানবিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে কোনো গবেষণাগ্রন্থ পড়ছি। শুধু গগনবিহারী কবিত্ব কল্পনার রামধনু রচনা নয়, বাস্তব জীবন সম্পর্কেও তাঁর অসাধারণ লোকজ্ঞানের পরিধি দেখে আমরা বিস্মিত হই।

স্বদেশ-প্রীতির সংস্কার সারদা-মায়ের প্রায় শৈশব থেকেই। জয়রামবাটীথেকে কোথাও যাত্রার আগে গৃহাঙ্গনের মাটি স্পর্শ করে তিনি প্রণাম করে বলতেন:—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। দেশের কোথাও কেউ বিদেশী রাজ-শক্তির হাতে নির্যাতিত হলে তিনি যন্ত্রণাবিদ্ধ হতেন। এবং কখনো বা শুদ্ধ ক্রোধে উদ্দীপ্ত। ইংরেজ সরকারের আমাদের পরাধীন দেশের মানুষের সঙ্গে

অবিরাম উদ্ধত হৃদয়হীন নিষ্ঠুর নির্লজ্জ ব্যবহারে তিনি ক্ষুণ্ণ ছিলেন। স্বাধীনতার স্বপক্ষে মাঝে মাঝে তাঁর প্রদীপ্ত বিশ্বরূপও আমাদের বিস্মিত বিমুগ্ধ করে। তবে একথাও এখানে স্মর্তব্য যে তাঁর স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-স্পৃহার পশ্চাতে কারো প্রতি, ব্যষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে, সামান্যতম ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিল না। ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশীদেরও তিনি নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। কিন্তু পরাধীনতার প্রশ্নে অত্যাচারী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর রুদ্রাণী-মূর্তিও প্রত্যক্ষ করেছি। দোহদ লক্ষণা দুটি নারীকে বাঁকুড়ার পুলিশ হাতকড়া দিয়ে বন্দী করে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে যাবার কথা শুনে তাঁর অগ্নিবাণী মনে পড়ে : "নিরপরাধ স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার··· তবে আর বেশীদিন নয়। এমন কোনো বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে দু' চড় দিয়ে মেয়ে দু'টিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?" সারদা-মায়ের এক ভক্তকে ঠাকুরঘর থেকে বের হওয়া মাত্র পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। অনর্থক কষ্ট দেবার সংবাদ পেয়ে মা বলেছিলেন : "দেখ দিকি, ইংরেজের কি অন্যায়! আমার ভালো ছেলেটাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলে, মুখে একটু ঠাকুরের প্রসাদও দিতে দিলে না। এই ইংরেজের রাজ্য কি থাকবে?"—দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও ভালবাসা। দেশের দুঃখ-দুর্দশার যে কোনো ঘটনাই মাতৃহৃদয়ে এসে আঘাত করত এবং তিনি উত্তেজিত হতেন। কখনো বা ইংরেজদের অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী শুনে, ওদের নির্মম শোষণ এবং উৎপীড়নের প্রতিবাদে তাঁর দুটি চোখ অগ্নিস্ফুরিত হত, কখনো বা ভেসে যেত বেদনাবিদ্ধ অশ্রুর অবাধ্য প্লাবনে। তাঁর জীবনে এরকম বহুবার ঘটেছে। স্বৈরাচারী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকায়ও সারদামাকে আমরা বহুবার দেখতে পেয়েছি। পরিশুদ্ধ তাঁর দেশপ্রেমের স্বাক্ষর-বহনকারী এরকম অজস্র ঘটনা ছড়িয়ে আছে সারদামায়ের জীবনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়—এত সুগভীর স্বদেশপ্রেম এবং অত্যাচারী শাসক ইংরেজ সরকারের অমানবিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর এত ক্ষোভ এবং এত আগ্নেয় ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও বিলেতের লোকদের তিনি 'নিজের ছেলে-মেয়ে' মনে করতেন, একথাও আগে উল্লিখিত। তাঁর জীবনে এরকম ঘটনাও প্রচুর। বিদেশী-বিদেশিনী ভক্তদের প্রতি তাঁর প্রীতি ও সৌন্দর্যপূর্ণ ব্যবহারের কথাও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। আসলে স্বদেশী আন্দোলন ও স্বদেশ-প্রেম

যে বিদেশী-বিদ্বেষ নয়—তাঁর এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বলেই তাঁর মধ্যে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এমন করে সমন্বিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। বস্তুত তাঁর জীবনাদর্শের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই মহাসমন্বয়ের বীজ।

সারদামায়ের চরিত্রে এরকম জাতীয়তা-আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় ঘটেছিল বলেই সর্বত্র সকলের প্রসঙ্গেই তাঁর সমদৃষ্টি। স্থির প্রত্যয়-সিদ্ধ যথার্থ একটি সাম্যবোধ জন্মলাভ করেছিল তাঁর মধ্যে। তাই এমন বলিষ্ঠ ও বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন: "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো—কেউই পর নয় মা, জগৎ তোমার।" জীবনের শেষ লগ্নে উচ্চারিত এই ক'টি কথার মধ্যে রয়েছে বিশ্বমানবতার অন্তঃশীল অম্লান ঐক্যের এক আশ্চর্য বিঘোষণা। মনীষী কেনেথ ওয়াকার বলেছেন: এই বাণীগুচ্ছের মধ্য দিয়ে স্বপ্রকাশিত হয়েছে বিশ্বমৈত্রী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও মিলনের মহোত্তম মন্ত্রবীজ। বিশাল বিচিত্র বিশ্বের মহামিলনের স্থায়ী কল্পসূত্র। তাই তিনি বলতে পারেন: "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা!" তাঁর কাছে পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' তত্ত্বটিও আর এক বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অর্থদ্যোতনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। তাঁর চরিত্রের এই পরমতসহিষ্ণুতার ফলেই তিনি একই সঙ্গে ব্যক্তির ও সমষ্টির স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের প্রতি সম্মান জানাতে পারতেন। সর্বাস্তিবাদে অকুণ্ঠ বিশ্বাস এবং সর্বার্থসাধক নববেদান্তের সার্বিক সম্প্রয়োগের ফলে সর্বত্র যে কেবল তাঁর প্রেমের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল এবং সকলকে সমানভাবে দেখার শক্তি অর্জন করেছিলেন তাই নয়, সামাজিক জীবনের সকল কর্মে সকলের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সংগ্রামী ভূমিকাও অবশ্য স্মরণীয়। এরই পরিণামে দেখা যায়, প্রিয় পুত্র বিবেকানন্দের মতোই সব রকম ভোগাসাম্য ও বিশেষাধিকারের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল বিদ্রোহ ঘোষণা করে গেছেন। তাইতো মায়ের কাছে ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ, জাতি-ধর্ম-গুণ-কর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সমান স্বাগত। অথচ কেউ কখনো কোনোভাবে বিশেষ অধিকার দাবি করতে পারত না তাঁর কাছে। আর শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'-তত্ত্বের ভিতরে তো অন্তর্নিহিত রয়েছে ব্যষ্টিগত ভাবে সকলের সমান স্বাধিকার এবং সমষ্টিগতভাবে সকল দেশের সব মানব-গোষ্ঠীর সার্বভৌমত্বের সহজ স্বীকৃতির অলিখিত ঘোষণা। ভক্ত ক্ষীরোদবালা

তাঁর এক আত্মীয়া লেডি ডাক্তার শ্রীমতী প্রমদা দত্তকে নিয়ে এসেছেন মাতৃ-সন্দর্শনে। সারদা-মাকে প্রণাম করে তাঁর আদেশেই তিনি একজন ভক্ত রোগী দেখলেন এবং তাঁর কাছে বসে আরো অনেক ভক্তের সঙ্গে তাঁর কথামৃত শুনলেন। অতঃপর প্রসাদ-বিতরণের সময় দেখা গেল তিনি সকলকেই প্রসাদ দিচ্ছেন কিন্তু প্রমদা দেবীকে দিচ্ছেন না। ব্যথিত শ্রীমতী প্রমদা দত্ত এর কারণ জানতে চাইলে সত্যাশ্রয়ী মা সারদা বললেন: "তুমি যে বাছা ব্রাহ্ম; তুমি স্বেচ্ছায় না চাইলে কী করে তোমাকে প্রসাদ দেই?"—এরকম উদার পরমত-সহিষ্ণুতা এবং অপরের ভাবের প্রতি ব্যক্তিস্বাধিকারের উদ্দেশ্যে সম্মান প্রদর্শন, ব্যক্তি-স্বাধীনতার এমন আন্তরিক স্বীকৃতি—চিরকালই পৃথিবীতে দুর্লভ। সর্বাস্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মহান মানবতাবাদে সারদা-মায়ের স্থির প্রত্যয় ছিল বলেই তাঁর জীবনে ধর্মসাধন ও কর্মসাধন, আধ্যাত্মিক তপশ্চর্যা ও সাংসারিক জীবনযাত্রা, ত্যাগ ও সেবা, গ্রহণ ও বর্জন—অর্থাৎ এক কথায় ভূমা ও ভূমির অপরূপ সম্মিলন সম্ভব হয়েছিল। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ সারদা-মার এই মহাজীবনকে বিশ্বশান্তির আশ্চর্য এক পথ-নির্দেশ বলে মনে করেছেন। এবং লোভে আর হিংসায় উন্মত্ত পরস্পর বিবদমান আজকের খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত এই পৃথিবীতে বিধ্বস্ত বিপন্ন মানুষ তাঁর জীবন ও আদর্শ থেকে মর্ত্যের মাটিতে ঘরে ঘরে শান্তি রচনার শিল্পে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে—বলে ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ বিশ্বাস করতেন। কিন্তু পরম পরিতাপের কথা যে, সারদাদেবীর ভারতবর্ষের মানুষ আমরা আজকাল—এখন বিশ্বশান্তির সন্ধানে ঘুরে মরছি বিদেশ থেকে আমদানি-করা বাক্-সর্বস্ব নানা মানবধর্মহীন অর্থহীন ইজম্-এর মধ্যে।

২৪

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর দাম্পত্য জীবন এবং নারী-পুরুষের আদর্শ সম্পর্ক

এতক্ষণ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদা দেবীর চরিত্রের উদাহরণ-সমৃদ্ধ যেসব গুণাবলী বিবৃত হল তা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে তাঁরা দুজন শুধু পরস্পরের পরিপূরক ছিলেন না, সম্পূরকও ছিলেন। পরস্পরকে তাঁরা

নির্বাচন করেছিলেন সকল মানুষের ইহ-পরত্রের সর্বাত্মক বন্ধন-বিমোচনের মহান ব্রত উদ্‌যাপনের প্রয়োজনে, একথা আগেই বলা হয়েছে। মনে হয় শুধু ভারতে নয়, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানব-সমাজে নর-নারীর আদর্শ সম্পর্কের একটি অগ্রিম পরিকল্পনাও রচনা করে গেছেন তাঁরা সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর জন্য এবং উদাহরণ বা ব্লু-প্রিন্ট হিসেবে নিজেদের যৌথ জীবনালেখ্যটি উপস্থাপনা করে। স্বামীজীও এই ব্লু-প্রিন্ট্‌টি সম্মুখে রেখেই ভারতীয় নারী-সমাজের আদর্শ ও ভবিষ্যৎ পথ-রেখা নির্মাণ করে বিশ্বজনের কাছে প্রচার করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর সমগ্র জীবনের চিত্রপটটি দেখে এবং তাঁদের জীবনাদর্শ অনুধাবন করে যে কোনো লোকের মনে হবে তাঁরা যেন একে অপরের জন্য তৈরী হয়েছিলেন। ইংরেজীতে 'partnership of life' বলতে আমরা যা বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীর দাম্পত্য জীবন ছিল সেই পাশ্চাত্য আদর্শেরও পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র ভাষায়: "দেবী নহি, আমি নহি সামান্যা রমণী। / পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি / নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে / পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ / মোরে, সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার / যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর / কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে / যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী, / আমার পাইবে তবে পরিচয়।" কিংবা শেক্‌স্‌পীয়রের পোর্শিয়ার সেই দৃপ্ত উক্তি: "And keep with you at meals, comfort your bed / And talk to you sometimes? Dwell I but in the suburbs / of your good pleasure? If it be no more, / Portia is Brutus' harlot, not his wife"—এ সব অসাধারণ কাব্যখণ্ড স্মরণে রেখেও বলবো—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসঙ্গিনীরূপে সারদা-মায়ের চরিত্রের আমরা যে গভীর অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ধার করতে পারি, যথার্থ নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তি-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সারদা-মায়ের যে বিশাল ব্যাপ্ত ভূমিকা, তার তুলনায় পূর্বোক্ত সব আদর্শকে মনে হয় একান্তই নিষ্প্রভ। মনে করুন, ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে ফলহারিণী কালী পূজার রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক সেই আশ্চর্য মাতৃ-পূজার আয়োজন। একালের অধ্যাত্ম জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ পূজার আসনে বসিয়ে স্বীয় সহধর্মিণীকে শুধু শ্রদ্ধাঞ্জলি

নয়, ষোড়শোপচারে পূজার পর জপের মালা এবং সমগ্র জীবনের সাধনার ফল তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ করে প্রণাম নিবেদন করছেন। পৃথিবীর মাটিতে তুলনাহীন অদ্বিতীয় এই অপূর্ব দাম্পত্য লীলা। পূজক ও পূজিতা এমনি করে যখন একটিমাত্র ভাববিন্দুতে মিলিত হয়ে একই আনন্দলোকের অভিযাত্রী—তখন তাঁদের মধ্যেকার সেই সুগভীর সত্য পরিচয় উম্মোচিত করবেন কে—পৃথিবীর কোন্ কবির সাধ্য হবে? শুধু এই মর্ত্যজীবনে নয়, জীবন ছাড়িয়ে মহাজীবনের দিব্যলোকেও তাঁরা নিত্য সম্মিলনে আযুক্ত। অনন্তের অতন্দ্র অভিসারে এগিয়ে চলেছেন আশ্চর্য দুই মানব-মানবী। স্থানকালের সীমারেখা সেখানে বিলুপ্ত। 'life partnership' শুধু নয়—, মর্ত্যের মাটিতে এই "life and life-beyond partnership"-এর এ-রকম আর কোনো উদাহরণ আমাদের জানা নেই।

আধুনিক জীবনপদ্ধতিতে পুরুষ-নারীর সমানাধিকার একটি স্বীকৃত সামাজিক সত্য। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক—সর্বক্ষেত্রে, সর্ব বিষয়ে নারীজাতির পুনর্বাসন ও স্বাধিকার স্বাধীনতা রক্ষা জরুরী বলে আজকের পৃথিবী মনে করে। জাতি-ধর্ম-উচ্চ-নীচ-ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে সকল মানুষের সমানাধিকার যেহেতু আজকের মানব-সভ্যতার একটি প্রত্যয়সিদ্ধ ঘোষণা, সেইহেতু সমগ্র মনুষ্যজাতির অর্ধেক—নারীকেও দিতে হবে স্বাধিকার। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনও নারীর এই সর্বাত্মক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। এবং জীবন রচনার এ আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা দেবীর জীবনে পূর্ণভাবে অনূদিত। পরস্পরের জীবনে নিজেরাই শুধু মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, ভারতীয় জনজীবনের সর্বত্র নারীকে তার নিজস্ব স্বাধিকারে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য উভয়েই আজীবন গ্রহণ করে গেছেন সংগ্রামী ভূমিকা। সমস্ত মানবিক অধিকার থেকে যে দেশের নারীসমাজ প্রবঞ্চিত, পুরুষের হাতে নিত্য নির্যাতন ও অত্যাচার যে দেশের নারীর একমাত্র বিধিলিপি এবং প্রত্যহের অতি পরিচিত স্বাভাবিক ঘটনা, স্বামীজীর ভাষায় নারী যেদেশে 'সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে' রূপান্তরিত, অথবা পুরুষের সনাতন ভোগের সামগ্রী মাত্র, সেই দেশে নিজের স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করে পদপ্রান্তে তার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করার ঘটনা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক বা ঐশী ব্যঞ্জনায় নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক

তাৎপর্যেও কী মহিমামণ্ডিত, কী সুগভীর সুদূরপ্রসারী তার প্রভাব, ভাবলে বিস্মিত হতে হয় এবং যথার্থই যুগাবতার বলে না মেনে উপায় থাকে না—এই পরমপুরুষকে। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনে নারীর বিশেষ ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ শৈশবে ধনী কামারনীর হাতে উপনয়নের প্রথম ব্রতভিক্ষা গ্রহণ; পরবর্তীকালে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তন্ত্রসাধনায় দীক্ষালাভ; আর দক্ষিণেশ্বরের নহবতে জননী চন্দ্রমণি—তিনি তো নিত্য পূজ্যা; আর আজীবন সঙ্গী সহযাত্রী জায়া, জীবনের সহধর্মিণী সহমর্মী ও সহকর্মী নারী—সারদাকেও দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করলেন, তাঁর চরণতলে দান করলেন প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি, জপের মালা; আর মন্দিরে যে জগন্মাতার নিত্য আরাধনা—তিনিও নারীরূপা। এবং গোলাপমা, গৌরী-মা, যোগীন-মা, গোপালের মা, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি যে সব সাধিকা নারী এসেছিলেন তাঁর জীবনে—তাঁদের সঙ্গেও বড় সুগভীর স্নেহের সম্পর্ক, বিশ্বজননীর প্রতিনিধিরূপে তিনি দেখতেন তাঁদের সকলকে—শ্রদ্ধা করতেন তেমনিভাবে।

শুধু মহাজীবনের অভিসারেই নয়, এই ধুলো-মাটির মর্ত্য-পৃথিবীতেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার আজীবন যৌথ ভূমিকা ছিল চূড়ান্ত বিপ্লবাত্মক। কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করেছিলেন বলেই, যথার্থ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁদের প্রতিটি বিষয়ে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। আমাদের দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের আগে ও পরে নারী-প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলন প্রসঙ্গে বহু নেতা-মহানেতাই গরম গরম অনেক বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের জীবনে নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তি—মহানগরীর ঐ বক্তৃতামঞ্চ অবধিই। স্বগৃহে, নিজেদের গৃহ-পরিধিতে তাঁদের অন্যরূপ, রূপান্তর। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রসিদ্ধ জননেতাদের জীবনে—তাঁদের সহধর্মিণীদের কোনো ভূমিকা ছিল না। এমন কি তাঁদের সহধর্মিণীদের নামটুকু পর্যন্ত আমাদের জানা নেই।—আর ঐ পাঁচ টাকা মাইনের লেখাপড়া না জানা অশিক্ষিত পুরুত তাঁর সমগ্র কর্মযোজনার সহযাত্রী, সহকর্মী ও সহমর্মী করে নিলেন সহধর্মিণীকে। সঙ্কটের পথে পার্শ্বে রেখে দুরূহ চিন্তার অংশভাক্ করে শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন তাঁর কঠিন ব্রতের সহায়িকারূপেই সারদাদেবীকে গ্রহণ করেছিলেন। —জীবনের সুখে-দুঃখে-স্বপ্নে-সাধনায় সারদাদেবীকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যিকার সহচরীরূপে দেখেছি।

জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী সারদাদেবীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এবং পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁদের জননী জগদ্ধাত্রীর কাছে পরামর্শ-উপদেশ-নির্দেশ-নিষেধ গ্রহণ করে সামাজিক ও অন্যান্য সকল সমস্যা ও যন্ত্রণার সমাধান খুঁজে পেতেন। শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ে নয়, সকল ব্যাপারেই মায়ের অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টি ও সহজ প্রজ্ঞা সঠিক সমাধানের সন্ধান দিতে সক্ষম হত।

প্রত্যহ জীবনচর্যায়ও দেখি পরস্পরের প্রতি প্রেমান্বিত শ্রদ্ধিত অনুরাগ। পরস্পরের উচ্চারিত মাধুর্যমণ্ডিত উক্তিগুলিও তাঁদের মধুর ও মর্যাদাসম্পন্ন মানবিক ও দৈবী সম্পর্কের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অকপট সাক্ষ্য দেয়। "ও সারদা-সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।" মায়ের সম্পর্কে গোলাপ-মাকে আবার বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: "জ্ঞানদায়িনী মহা বুদ্ধিমতী। ওকি যে সে? ও আমার শক্তি।" আবার বলছেন: "আমার কাজ অর্ধেক মাত্র হয়েছে, জগতের কল্যাণের জন্য বাকী কাজ ও করবে।" কিংবা প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই স্বপ্নাদেশ: "আমি কি মরেছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ।" স্বামীর অদর্শনে বিষাদময়ী মাকে আশ্বাস দিয়ে আবার তিনি বলছেন: "তোমার মরা হবে না; তোমায় থাকতে হবে। আমি আর কজনকে দেখেছি, তোমার কাছে আরো ঢের মানুষ আসবে—তাদের ভার তোমার উপর।" কিংবা: "না, তুমি থাকো, অনেক কাজ বাকী আছে —না না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে। দেখ কলকাতার লোকগুলি যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল্‌বিল্ করছে। তুমি তাদের·দেখো···"

শুধু কলকাতার নয়, বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্বের মানুষেরাই অবক্ষয়ের অন্ধকারে, লোভে হিংসায় রিরংসায়, আসন্ন আণবিক যুদ্ধের সর্বগ্রাসী ধ্বংসের শঙ্কায় বিপন্ন বিধ্বস্ত, জাগতিক নানা দুঃখ-দুর্দশায় আহত, আর্ত বেদনায় কিল্‌বিল করছে। এদের সকলের সর্বাত্মক বন্ধনবিমোচনের যুগ-প্রয়োজনেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার আবির্ভাব। এই মহত্তম কর্মের সার্থক যোজনার জন্যই সারদা মাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে নির্বাচন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীর নির্বাচনের আগেই আবার মা নিজেই হলেন স্বয়ংবরা। বিশ্বজননী মা দুর্গা নিজেও স্বয়ংবরা। আর স্বামীজীর আদর্শ নারীত্রয় সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী—এঁরাও তাই। এবং সহধর্মিণীরূপে ঘরে বাইরে এঁদের সকলেরই ছিল শ্লাঘ্য ভূমিকা।—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় মায়ের এই সহধর্মিণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

—তত স্পষ্ট নয়, কিন্তু পরবর্তীকালে আদর্শ সঙ্ঘজননীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের অসমাপ্ত কর্ম মহৎ নৈপুণ্যের সঙ্গে মা সারদা সার্থকভাবে সম্পন্ন করে গেছেন। শুধু সঙ্ঘজননী সঙ্ঘপালিকাই নন, ভক্তজননী এবং গুরু জ্ঞানদায়িনী একই সত্তায় এক দেহে এই তিন রূপেরই অপূর্ব আলোকিত সমন্বয় প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে আমরা তাকিয়ে থাকি এই দেবী-মানবীর দিকে। এই তিন মূর্তিতে, তিন রূপেই অজস্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল সারদা মাকে। তাঁকে এইসব বিশাল ব্যাপ্ত মহান এবং দুরূহ কঠিন ভূমিকাগুলি একদিন নিতে হবে—একথা জানতেন বলেই নিজেকে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছেন: "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী করতে হবে। বস্তুতঃ অনেক অনেক বেশীই করে গেছেন সারদাদেবী। এবং প্রকৃত অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত প্রারব্ধ কর্মের সমান অংশীদার হয়ে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে একদিকে বিশ্ববন্দিতা জগজ্জননী হয়ে সকল মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, আবার অন্যদিকে প্রাত্যহিক লৌকিক জীবনের সকল ভূমিকাও সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে গ্রহণ করে ঠাকুরের আদর্শ জায়ারূপে শ্রীমা সারদা যে সহমর্মিতা, সহধর্মিতা ও সহকর্মাদর্শ গ্রহণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন—তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা শ্রেয়া নারী চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, বেহুলা, পোর্শিয়া, পেনিলোপী, লুক্রেশিয়া,—এমন কি সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর স্রষ্টা বা পৃথিবীর কোনো কবি, মহাকবি—কারোর কল্পনায় পর্যন্ত আসেনি। একদিকে অধ্যাত্ম অনুভবের শীর্ষে আরোহণ করে মানুষকে মুক্তি দিচ্ছেন, আবার অন্যদিকে দশভুজা হয়ে সংসার পরিচালনা করছেন: "কুটনো কুটছেন, রান্না করছেন, পূজোর গোছ করছেন, পূজান্তে প্রসাদ ভাগ করছেন, পান সাজছেন, সুপারি কাটছেন···আটা-ময়দা মাখছেন, রুটি-লুচি তৈরী করছেন, কলসীতে জল আনছেন, ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন, বর্ষার দিনে বাড়ীর সকলের ভিজে কাপড় শুকোবার চেষ্টা করছেন, সলতে পাকাচ্ছেন, প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন, লণ্ঠনগুলি পরিষ্কার করছেন, এমন কি সকলের অসাক্ষাতে এঁটো তুলছেন, ঘুঁটে পর্যন্ত দিয়েও আসছেন।" কাজ তুচ্ছই হোক, অথবা বৃহৎ, তার সম্পর্কে মূল্যবোধ, আর তাতে নিষ্ঠা—এই তো কর্মশিক্ষা বা কর্মযোগের গোড়ার এবং শেষের কথাও। এবং এই কর্মযোগের মাধ্যমেই তো লৌকিক—

অলৌকিক—দুই অর্থেই, মানবসাধারণের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি সম্ভব, সম্ভব বিশ্বমৈত্রী বিশ্বসৌভ্রাত্র এবং "এক জাতি—এক বিশ্বের" স্থাপনাও। তাই প্রাজ্ঞ সমালোচক যথার্থই বলেছেন: "ঠাকুরের আবির্ভাব যদি সবধর্মসমন্বয় সাধনে, তবে শ্রীমা সারদার আবির্ভাব সর্বধর্ম-সমন্বয় তত্ত্বের লৌকিক সম্প্রয়োগে, বাস্তব রূপায়ণে এবং সর্বকর্ম-সমন্বয়-সাধনের প্রয়োজনে।"

স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস যে কথা বলেছেন: "গৃহিণী-সচিব-সখিমিথ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এর চেয়েও বোধ হয় অধিক ছিলেন। বস্তুতঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নর-নারীর সমানাধিকার এবং সমমর্যাদার সম্পর্ক এর চেয়ে বেশী আর কিছু কল্পনা করা যায় না। একালের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-পুরুষ সর্বজনবন্দিত স্বামীর কাছ থেকে তিনি যে অপর্যাপ্ত ভালোবাসা, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা পেয়েছেন—তার কোনো তুলনা নেই। তিনি নিজের মুখে সে সব কথা নানা প্রসঙ্গে উচ্চারণ করে গেছেন বার বার। "ওকে (সারদা দেবীকে) কাঁদতে দেখলে আমার ঈশ্বরভক্তিও উড়ে যাবে"—অভিমানে বেদনাহত তরুণী স্ত্রীর অশ্রুনত মুখ দেখে একথা বলছেন ঈশ্বর-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ। বিয়ের পর থেকেই—বুকের মধ্যে—মায়ের সাধনা-স্নিগ্ধ পবিত্র হৃদয়ে স্থাপিত হয়েছিল পরিপূর্ণ অমৃতের আনন্দ-ঘট। এবং পরিপূর্ণ সেই অমৃতঘটের প্রসন্ন পুণ্য বারিতে অভিষিক্ত হয়ে নবজীবন লাভে ধন্য হয়েছিল লক্ষকোটী মানুষ।…"শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন উক্তি ও আচরণ থেকে পরিস্ফুট যে তাঁরা দুজনে অভেদাত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরুর সম্প্রসারিত শাখা শ্রীমা। উভয়ের সমকেন্দ্রিক জীবন এবং একই উদ্দেশ্য-অভিমুখীন আচরণ প্রমাণ করে যে তাঁরা একই ভাবাগ্নির দুটি শিখা। একই শক্তিতরঙ্গের দুইটি ধারা, একই সত্যের দুটি অবয়ব। যেমন ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শক্তি শ্রীমা।" মা-সারদা নিজেও অবহিত ছিলেন দুজনে মিলেই গ্রহণ করতে হবে নবজীবন রচনার এই মহান যুগদায়িত্ব। তাই তিনি স্বমুখেই বলেছেন: "বাবা, জানো তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে রেখে গেছেন।" আবার বলছেন: "যেই ঠাকুর, সেই আমি" কিংবা—"আমিও ভগবতী, লোকে বলে কালী, আমি মৃত্যুঞ্জয়।"

এমন কি বাইরের লৌকিক দৃষ্টিতে এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষার বিচারেও মাকে যে ঠাকুর কতখানি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন—তার অজস্র উদাহরণের মধ্যে দুটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি:—মন্দিরের দেবীকেও যিনি "তুই" সম্বোধন করেছেন বারবার, তিনি কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী এই দেবী-মানবীকে একবার মাত্র, তাও ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী ভেবে ভুল করে 'তুই' বলে একান্ত সঙ্কুচিত এবং পরিতপ্ত। আক্ষেপের ক্ষোভের তাঁর সীমা-পরিসীমা নেই, অপরাধবোধের অন্ত নেই। অনিচ্ছাকৃত এই অপরাধের জন্য বিদ্যা-স্ত্রীর কাছে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করে যেন শান্তি নেই। অতঃপর আর একটি উজ্জ্বল আলেখ্য:—একদিন শ্রীমা ঠাকুরের পদ-সংবাহন করতে করতে জানতে চাইলেন: "আমাকে তোমার কী মনে হয়?" তদুত্তরে ঠাকুরের সেই চতুর্মাত্রিক চেতনায় ভাস্বর—এবং একই সঙ্গে শেষতম সহৃদয় মানবিক, গভীর দার্শনিক এবং অখণ্ড আধ্যাত্মিক উত্তর: "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য-সত্য দেখতে পাই।"—এইভাবে ঘরে বাইবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং পরিপূর্ণ প্রেমের এবং অন্তহীন কর্মনিষ্ঠ যৌথ জীবনযাপন করে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী নারী-প্রগতি নারীমুক্তি আন্দোলনের পূর্ণ পরিণামের মহত্তম চিত্রটি তুলে ধরে দিয়ে গেলেন—তাঁদের প্রিয় স্বদেশবাসীদের হাতে। এবং সে তাঁদের কোন্ স্বদেশ? এখনো পরানুবাদ পরানুকরণে আত্মভ্রষ্ট, ক্লীব কাপুরুষ অক্ষম অপদার্থ হৃত-সর্বস্ব, অবক্ষয়ের অন্ধকারে ক্লিষ্ট হতাশাচ্ছন্ন সেই স্বদেশ:—একদিকে এখনো যেখানে নারীসমাজের এক বিরাট অংশ পুরুষের পদপাতলাঞ্ছিত, অবমানিত, নিত্য নির্যাতিত, প্রত্যহ-প্রহারই যেখানে স্বামী দেবতার কাছে নারীর একমাত্র প্রাপ্য, যে দেশের কবিকণ্ঠেও ঘোষিত ঢাক-ঢোল আর নারী, এদের না পেটালে বোল ওঠে না, নারী এখনো যেখানে ভোগ্য পণ্যসামগ্রী মাত্র, পণপ্রথার ছদ্মবেশে এখনো নারী-দাস ব্যবসা বহুল প্রচারিত, দুবেলা দুমুঠো অন্নের বিনিময়ে নারী এখনো যে দেশে সর্বক্ষণের বিনে মাইনের দাসী মাত্র, শিক্ষা-দীক্ষা-বিবর্জিত, স্বাস্থ্যহীন ও শ্রীহীন পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র (Son Producing Machine)-এ রূপান্তরিত এবং

অন্যদিকে আবার তথাকথিত নারী-প্রগতি ও নারীমুক্তি আন্দোলনের ছদ্মনামে উৎকেন্দ্রিক সমাজের উচ্চ মঞ্চের মুষ্টিমেয় নারীর দল স্বধর্মভ্রষ্ট বিপথগামী পুরুষের অনুকরণে প্যান্ট-শার্ট প্রভৃতি কিম্ভূতকিমাকার কিংবা স্বল্পতম পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে, সিগারেট-মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও নির্বাধ পশ্বাচারে লিপ্ত হয়ে আছে—এ তাঁদের সেই স্বদেশ।

২৫

বিশ্বমাতৃত্বের আদর্শ জননী সারদার জীবনই নারীমুক্তির সার্বভৌম সনদ

শুধুমাত্র জীবনসঙ্গিনী-রূপেই নয়, জননীরূপেও মাতৃকণ্ঠে ধ্বনিত প্রধ্বনিত হয়েছে যে বিশ্বাসের বাণী, যে অভয়ের আশীর্বাদ, আশ্বাসের যে মহামন্ত্রোচ্চারণ তারও বুঝি কোনো তুলনা নেই। মাতৃত্বেই নারীর শ্রেষ্ঠতম পরিণতি। মাতৃত্বের মধ্যেই মানবিক সকল গুণরাশির বিকাশ ঘটে। নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম এবং স্নেহ-মায়া-মমতা প্রভৃতি গুণগুলি নারীর মধ্যে সহজেই মাতৃত্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুসুমিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের নারীকুল মাতারূপে পরিচিত হতেই সবচেয়ে গৌরবান্বিতা বোধ করেন। স্বামীজী তাই বলেছেন: ভারতে যখন আমরা আদর্শ রমণীর কথা ভাবি তখন আমাদের একমাত্র মাতৃভাবের কথাই মনে আসে। মাতৃত্বেই তাদের আরম্ভ, মাতৃত্বেই তাদের শেষ। ভারতবাসী ভগবানকেও মা বলে ডাকে। ভারতীয় নারী স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে, স্বাধিকারপ্রাপ্তিতে আত্মনির্ভর হয়ে বিশ্বসভায় গৌরবের আসন গ্রহণ করুক—কিন্তু কোনোক্রমেই তাদের দুর্লভ মাতৃত্বের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নয়—স্বামীজীর ছিল এই উপদেশ।

মূলতঃ ভারতীয় নারীকে ভারতীয় থাকতে হবে এবং মাতৃত্বের মহান আদর্শ তাকে জীবনের যথার্থ পথের সন্ধান দেবে এই ছিল স্বামীজীর ইচ্ছা এবং বিশ্বাস। সারদা মায়ের মহান মাতৃমূর্তি দেখেই স্বামীজীর অন্তরে এই ইচ্ছা ও বিশ্বাসের জন্ম ও পরিণতি। এবং তাঁর সেই করুণাঘন দিব্য

মাতৃমূর্তির কাছে শুধু স্বামীজী নন, তাঁর সন্তানেরাই নন, সমগ্র বিশ্বই নতজানু। সারদা মায়ের জীবনচিত্রটি বহুবর্ণসম্পাতে একটু বিশদভাবেই এখানে উপস্থাপিত করা হল, কারণ এ তো শুধু জীবনকাহিনী নয়, এর মধ্যে যে বিধৃত হয়ে আছে পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা—অর্থাৎ সমগ্র নারীজাতির ভবিষ্যৎ পথ-নির্দেশ। আপাতদৃষ্টিতে সারদা মায়ের ছোট্ট জীবনটি যেন ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে বিশ্বের যথার্থ নারীপ্রগতি ও নারীমুক্তির একটি সার্বভৌম মহাসনদ বা স্থায়ী পরিলেখ-পরিকল্পনা। কল্যাণশ্রীতে উদ্ভাসিত তাঁর এই মহোত্তম জীবন-যজ্ঞবহ্নির প্রদীপ্তালোকেই স্বামীজী রচনা করেছিলেন একই সঙ্গে বিশ্বের নারী ও পুরুষ—সকলের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির শাশ্বত মহাকাব্য—বিশেষ করে উচ্চারণ করেছিলেন বিশ্বপ্রসবিনী মাতৃজাতির স্বাধিকারের স্বর্ণসিংহাসনে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠার মহামন্ত্রমালা এবং শিব ও শুভ মহিম্নঃস্তোত্র।

বস্তুতঃ বিপন্ন বিধ্বস্ত—নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতার কাছে (Suffering humanity) মা সারদা ছিলেন মমতাময়ী আশ্বাসের মতো, গহনঘন দুঃসহ কালো দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির পর এ যেন সূর্যস্নাত শিশিরস্নিগ্ধ নরম ভোরের কোমল মধুর আলাপনী। আশার বাণী, আলোর শঙ্খ শুনিয়ে তিনি কাটিয়ে দিতেন সমস্ত কুয়াশার করুণ ক্লান্তি, অবসন্নতা। নব নব প্রাণযোজনায় আমাদের খণ্ড ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত জীবনকে প্রবাহিত করে দিতেন সার্থকতার মহা-মোহনার অভিমুখে। মানুষের চেতনার গভীরে বাঁচার বিদ্যুৎ-প্রেরণা সঞ্চারিত করে দিয়ে অবিরাম তাকে প্রাণদৃপ্ত ফুল্লকুসুমিত এবং ফলপ্লাবী করে রাখাই তো মাতৃত্বের অনন্য মঙ্গলকৃত্য। এবং জীবনের ভালোবাসাই তো মানুষকে বেঁচে থাকতে শেখায়। সারদা মায়ের এই ভালোবাসাই বৃহত্তর জীবনের অভিমুখে আমাদের পদযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে দিয়ে যায়। আশাহত আত্মভ্রষ্ট সারদা মায়ের এক দীন সন্তান তাঁকে বলেছিলেন: "এখন আমি করি কি? তবে কি মা, আমি রসাতলে গেলুম?"—এইকথা শুনে গর্জে উঠলেন আমাদের মা সারদা—জগজ্জননী: "কি, আমার ছেলে হয়ে রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধিরও সাধ্য নেই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।" মানুষের শাশ্বত শুভবোধে ও সর্বাস্তিবাদে বিশ্বাসী মায়ের এই আশাবাদী মাতৃমূর্তির চরণ স্পর্শ করে আমরাও যেন ঘোষণা করতে পারি—আমরা মায়ের সন্তান—জীবনপথে

নির্ভীক পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে চলবো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। সমকালীন সমাজের চারিদিকে ধ্বংস-মৃত্যু, লোভ-হিংসা, কলহ-সংশয়-শাঠ্য-ষড়যন্ত্র-স্বার্থপরতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আত্মহননের মাঝখানে নৈরাশ্যে অবসাদে ও বিপন্ন বিষাদে তলিয়ে যাবার মুহূর্তে সারদা মায়ের কথা মনে করে তাঁর কাছে এই দুঃখজয়ের প্রার্থনাই আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হোক। আমরা আবার বাঁচি। নবজীবন রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করি।

কিন্তু এ প্রার্থনা নিবেদন করার মতো সাহস, শুচিতা এবং সরলতাও কি আর অবশিষ্ট আছে আমাদের চরিত্রে? গুরু ও গুরুপত্নীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বামীজী তাঁর সমগ্র জীবন ভরে নারীকে দিয়ে গেলেন পরম সম্মান। নারীকে প্রতিষ্ঠার স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাবার জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে গেলেন দেশজননীর চরণতলে। আর আমরা দেশ জুড়ে আজ নারীমেধযজ্ঞে মেতে উঠেছি। পণপ্রথার জগদ্দল পাথর জাতির বুকের উপর চেপে বসে আছে আজো। অমানবিক এই লোভের ষড়যন্ত্র এবং নারীর উপর আরো নানা কদর্য ভ্রষ্টাচার ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের চারিদিকে। ছদ্মবেশে উপরি পাওনা আদায়ের সাঙ্কেতিক যন্ত্র হিসেবে বধূ-নির্যাতন এবং বধূ-বলি সারাদেশে চলেছে অবাধে। প্রত্যহ পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই একই নির্লজ্জ নির্মম সংবাদের অসহায় পুনরাবৃত্তি। লেখাপড়া-জানা পরিবারেও দেখেছি দাসী-বাঁদীর সম্মানটুকুও দিতে চাই না আমরা আমাদের মা-বোন, আমাদের সহধর্মিণীদের—নারীরূপী আমাদের প্রিয় পরিজনদের। অথচ তারাই দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা এবং তারাই বিশ্বপ্রসবিনী জগৎ-জননী।

২৬

বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার প্রতিকারে রামকৃষ্ণ-আন্দোলন

ঘরে ঘরে চলেছে এই নির্লজ্জ পাশবিকতা, নিষ্ঠুর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির ফলাও কারবার। আর বাইরে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতার উৎকট বীভৎসতা; সর্বনাশা ঘনঘটা—সর্ববিধ্বংসী ঝড়ের সঙ্কেত! এই বেদান্তের দেশে কাউকে আজ আর আমরা আপন করে নিতে পারছি না।

আমি নিজে ছাড়া আর সবাই খারাপ, সবাই মন্দ :—এই আত্মবিনাশী স্বার্থবোধ ক্রমশঃ গ্রাস করছে আমাদের। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে দেখুন। গুরুর গুরু (শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তসাধনার গুরু মহারাজ তোতাপুরী) এক বর্ণও বাংলা জানতেন না—আর শিষ্য, আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণও জানতেন না এক বর্ণ হিন্দী। কিন্তু কী সুগভীর মানবিক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দুজনের মধ্যে। অথচ দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণে মাত্র এগার মাস ছিলেন গুরু তোতাপুরীজী। অনেকে হয়তো জানেন না যে এই তোতাপুরীর 'পুরী' নামেই চিহ্নিত হয়ে আছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সমগ্র সাধু-সম্প্রদায়। সন্ন্যাসীদের দশ-নামী সম্প্রদায়ের জগতে রামকৃষ্ণ-সন্তানেরা 'পুরী' নামেই পরিচিত। আর আমরা এখন এক প্রদেশের মানুষ আর এক প্রদেশের মানুষকে সইতে পারি না। প্রীতি-প্রেম-সহানুভূতির কথা দূরে থাক, পরস্পরকে ঘৃণা করছি আমরা। এবং এই ঘৃণার বিষ ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ছে ভারতবর্ষব্যাপী। ছাতু, তেঁতুল, মেড়ো, উড়ে, কাফের, নেড়ে, বঙ্গাল, ভেতো, মচ্ছি-খেকো, ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি জঘন্য সব কুৎসিত বিশেষণ প্রয়োগ করে পরস্পরকে আজ আমরা গালি দিচ্ছি। এই ঘৃণার বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে রাজনীতিতেও কিংবা বলা যায় অসুস্থ রাজনীতি থেকেই এই বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। "এক জাতি এক প্রাণ একতা"-র আদর্শ আর বেঁচে নেই। বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্ম হচ্ছে একের পর এক এবং কোমর বেঁধে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ঘৃণার বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছেন রাজনীতির দাদারা আপাত-সিদ্ধির দুর্মর লোভে—ব্যক্তি-স্বার্থের গোপন চরিতার্থতায়।

এর সঙ্গেই ক্রমে আসছে ভাষা ও অন্যান্য আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে নানা ধরণের অশোভন ও অশুভ রাজনীতির নির্লজ্জ ঘৃণ্য চক্রান্ত। ভাষা নিয়ে, জাতপাত নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, বর্ণভেদ নিয়ে আগুন জেলে পুড়িয়ে দিচ্ছি মানুষের ঘরবাড়ী, খুন করছি মানুষকে, ভাইয়ের রক্তে কলঙ্কিত করছি হাত, সাতপুরুষের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিচ্ছি নিজের সহোদরকে। অথচ গুরু নিজে করেছিলেন ইসলাম ও নানা ধর্মের সাধনা, আর শিষ্যের (স্বামীজীর) তো খ্রীষ্টান-মুসলমান-জৈন-পার্শী ভক্ত-শিষ্যের সীমা-সংখ্যা নেই। তবু হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা আজো সমানে চলেছে

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজীর দেশ—সমগ্র এই উপমহাদেশ জুড়ে। ধর্মের নামে অর্থহীন মিথ্যা দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তির উপর নির্ভর করে ভাগ হয়ে গেল গোটা দেশটা। অঙ্গচ্ছেদ হল দেশ-জননীর। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের অমার্জনীয় এই রাজনৈতিক অপরাধ, ঘৃণ্য এই ষড়যন্ত্রী লোভ ও শাঠ্যের বিরুদ্ধে ধিক্‌কার উচ্চারিত হল না কারো কণ্ঠে একটিবার। আজ আবার নতুন করে বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন জ্বলতে শুরু হয়ে গেছে আসামে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, ত্রিপুরায়, মণিপুরে। তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই আমাদের। লোভ ও লালসায় অন্ধ আমাদের রাষ্ট্রনায়ক দেশনেতারা শুধু রাজনীতির পাশার ছক সাজাতে ব্যস্ত নিজেদের ব্যক্তিগত এবং দলের ক্ষুদ্র স্বার্থে।

২৭

বর্তমান সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা

সুতরাং এ যাবৎ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে বর্তমান সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের এবং রামকৃষ্ণ-সারদা-জীবনাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা আরো বেড়ে গেছে। আটত্রিশ বছরের স্বাধীনতা-উত্তর জীবনের নানা বিষময় তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের যদি কিছু শিখিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে পারব স্বামীজী-নির্দেশিত পন্থানুসরণেই একমাত্র এ জাতির ক্রমমুক্তি সম্ভব, সমস্ত সমস্যার জাল ছিন্নভিন্ন করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান এখনো আমরা বেরিয়ে আসতে পারি বিপন্ন এই গোলকধাঁধা থেকে সচ্ছল সুন্দর সর্ব-শোষণমুক্ত এক মহাজীবনের উদার অঙ্গনে। এবং এখনো সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়নি। দেশের মানুষকে স্বামীজীর আদেশ উপদেশ অনুরোধ—দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর ভর্ৎসনা ও আশীর্বাদ—প্রভৃতি অনুসরণ ও অনুধাবন করে এখনো আবার আমরা সুস্থ সহজ জীবনের অভিমুখে অভিযাত্রী হতে পারি। কিন্তু এর পরে হয়ত সমূহ-বিনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর কিছু করার থাকবে না।

সাম্প্রতিক কালে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় একটি নিবন্ধে বর্তমান কালের সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কটসমূহের একটি নির্ভুল বিশ্লেষণাত্মক চেহারা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। অতীত ভারতে যে

সব সমস্যা ছিল, এমন কি স্বামীজীর সমকালেও, এবং যে সব সমস্যা ও সঙ্কট আজো বর্তমান তা হল: (১) ঘরে বাইরে ভারতের সংহতিনাশক চিন্তাভাবনা ও নানা অপচেষ্টা। (২) হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-শিখ, উত্তরাপথ-আর্যাবর্ত বা আর্য-তামিল সমস্যা এবং চারিদিকে ধর্মান্তরীকরণের প্রবণতা এবং এই শেষোক্ত ব্যাপারে বিভিন্ন বহিঃরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্যদান। (৩) উচ্চ-নিম্নবর্ণের সংঘাত (এই বিষয়টি নিয়ে স্বামীজী তাঁর বাণী ও রচনার বহু পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন)। (৪) মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য ও সমাজে নিদারুণ অর্থনৈতিক অসাম্য। (৫) সাধারণভাবে শিক্ষার অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে কুশিক্ষার বা বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব। (যদিও সেকালে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে হস্টেলে র‍্যাগিং নামক বস্তুর আমদানি হয়নি। হয়তো সেদিনের ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সমকালীন ভ্রাতৃবরণের মতো কোনো সুস্থ উৎসবেরও প্রচলন ছিল না, এখনো নেই, তথাপি পশ্চিম থেকে আমদানি করা ভ্রাতৃবরণের পাশ্চাত্য সংস্করণ র‍্যাগিং নামক এই পাশবিক পদ্ধতিটির সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ছিল না।)

—অতঃপর এইসব সমস্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো কয়েকটি নতুন সঙ্কট। সেগুলি হল এই: (৬) জাতীয়তাবোধের ও স্বদেশচেতনা বা স্বাদেশিকতার হ্রাস (হয়তো এখনো বিনষ্টি বলা চলে না) ও আঞ্চলিকতার ক্রমঃপ্রসার। (৭) ধর্মপ্রভাব ও ধর্মগৌরবের হানি। (ধর্ম, ভগবান, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি শব্দাবলী প্রসঙ্গে আধুনিক মনে এক ধরণের ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও আতঙ্কের ভাব প্রকট, বিশেষ করে উন্নাসিক আঁতেল মহলে।) (৮) উচ্চতর সংস্কৃতি-সভ্যতা সম্পর্কে সাধারণের ঔদাসীন্য ও প্রলয়ঙ্করী অজ্ঞতা এবং তার ফলে শিল্প-সাহিত্যের ক্রম-অবনতি। (৯) শিক্ষাজগতের নৈরাজ্য এবং শিক্ষার আদর্শ ও প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে চরম বিভ্রান্তি। (১০) একদিকে অধিকারবোধের বৃদ্ধি, অন্যদিকে সমমাত্রার চেয়েও অনেক বেশী হারে কর্তব্যবোধের হ্রাস। (১১) জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনার অবলুপ্তি, দুর্নীতির নিদারুণ প্রসার, (১২) সামাজিক জীবনে সহৃদয়তা ও সহানুভূতির অভাব। (১৩) হিংসা ও বিদ্বেষের প্রকোপ, আত্মস্বাতন্ত্র্য ও ভয়াবহ পাশবিক স্বার্থবুদ্ধির প্রাবল্য।

সতর্ক পাঠক দেখবেন স্বামীজীর রচনাবলীতে এবং তাঁর অমূল্য পত্রগুচ্ছের মধ্যে এইসব জাতীয় সমস্যা ও সঙ্কটেরই আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ—এবং এর কারণসমূহের আবিষ্কার ও সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সমস্যা সমাধানের পথ-নির্দেশও। এমনকি সাম্প্রতিক কালের সমস্যাবলীও (যেমন হিন্দু-শিখ এবং তামিল-আর্য সংঘাতের প্রসঙ্গ) তিনি তাঁর অসীম প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যে সেদিনই অনেকটা দেখতে পেয়েছিলেন। এবং বর্তমান গ্রন্থে ইতঃপূর্বে এইসব প্রসঙ্গ ও প্রশ্নই আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আমরা দেখেছি কী গভীর বৌদ্ধিক নৈপুণ্য ও অসাধারণ ইতিহাস চেতনার সঙ্গে অপরিসীম সহানুভূতির সম্মিলন ঘটিয়ে এইসব জাতীয় সঙ্কট ও সমস্যাবলী নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। স্বামীজীর মতে আধ্যাত্মিকতার এবং জাতীয়তার সুদৃঢ় ভিত্তি ছাড়া কোনো রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সার্থক হতে পারে না। অথচ অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ মানুষেরা আঞ্চলিকতা ও গোষ্ঠীবাদের মাধ্যমে ও সহায়তায় নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টিত হতে পারে এবং হয়। এমনকি সাময়িকভাবে ধর্মত্যাগ করে আঞ্চলিক রাজনীতির আশ্রয় নিতে পারে। কিংবা ধর্মকেই আঞ্চলিক রাজনীতির হাতিয়ার করে নিতে পারে। কিন্তু তাতে সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয় না, হতে পারে না। এর একমাত্র নিরাকরণ সম্ভব জাতীয় সম্পদ ও উপার্জনের সমবণ্টন অথবা প্রয়োজনভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা এবং উৎপাদন-যন্ত্রশক্তির উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রসারে।

জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের উদ্দীপন ছাড়া কোনো বিশেষ ভূখণ্ডে মানুষে মানুষে আজ আর মিলন ও ঐক্য সম্ভব নয়। এবং এ যুগে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সম্ভব নয়। অথচ জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত না উদগ্র আগ্রাসী জাতীয়তাবাদে (Aggressive Nationalism) রূপান্তরিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। বেদান্তের বিশ্বৈক্যবোধই এর একমাত্র প্রতিষেধক। স্বামীজী আরো বলে গেছেন এ হল আন্তর্জাতিকতার যুগ। এককভাবে কোনো দেশ, কোনো জাতি, কোনো রাষ্ট্রই এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে একক প্রচেষ্টায় সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাই স্বামীজী বললেন: *"রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও*

যে সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না।...আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি হইতেই শুধু উহাদের মীমাংসা করা যাইতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—ইহাই এ যুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্বভাব কীভাবে বিস্তৃত হইতেছে,—ইহাই তাহার প্রমাণ।" জগৎ জুড়ে ক্রম-প্রসারিত এই "একত্বভাব"—স্বামীজীর কাছে অনুভূত হয়েছিল বলেই এমন গভীর প্রত্যয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথা তিনি উচ্চারণ করে গেছেন: "আমরা তাহাই চাই, ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা নয়, সকলের জন্য সমান সুযোগ...।" স্বামীজীর এই জীবন-নীতি সমষ্টির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, সমানভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পঞ্চশীল-নীতির প্রয়োগ করে, জোট-নিরপেক্ষ জাতি-সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের ভারত সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আংশিকভাবে হলেও, স্বামীজীর প্রদর্শিত পথ ধরে অগ্রসর হতে পেরেছে এবং তার অত্যাশ্চর্য সুফলও পেয়ে আসছি আমরা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ ভারতবর্ষ একটি বিশিষ্ট দেশরূপে সকল দেশে সম্মানিত। পররাষ্ট্রনীতিতে আমাদের সাফল্য ও সার্থকতা কম শ্লাঘ্য নয়। অবশ্য তার ফলে অনেক শত্রুও তৈরী হয়েছে আমাদের। কোনো কারণেই কারো স্বাধিকার ছিনিয়ে নেয়া চলবে না। কোনো জাতি বা গোষ্ঠীকে প্রবঞ্চিত করে অপর কোনো জাতির বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ লাভ করা অপরাধ। কারণ সকলের জন্য সমান সুযোগ দান করাই স্বামীজীর আন্তর্জাতিকতার প্রধান লক্ষ্য। "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"—এই ছিল বিশ্ব ধর্মসভায় স্বামীজীর মহান ঘোষণা। সর্বাস্তিবাদে বিশ্বাসী স্বামীজীর সম্পন্ন সচ্ছল জাতীয়তার মধ্যেই সন্নিহিত উদার আন্তর্জাতিকতার বীজ। তাই তাঁর পরিকল্পিত ধর্মরাষ্ট্রে স্বদেশ-অনুশাসন ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। স্বদেশে যেমন সকল স্বদেশবাসীর মিলন ও ঐক্যের মধ্য দিয়ে, সব মত ও পথের সমন্বয়ে মহৎ মানবধর্মে বিধৃত এক নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও স্বামীজী তেমনি সকল দেশের, সকল জাতির বৈচিত্র্য, বিশিষ্টতা ও অনন্য-

তার 'অস্তি'-কে শুধু স্বীকৃতি দিয়ে নয়, সমান শ্রদ্ধা নিবেদন করে সকলের উদ্দেশ্যে সকল জাতির, সকল দেশের মহামিলনের মহৎ একটি স্থায়ী ঐক্যের ভিত্তিভূমি রচনা করে গেলেন।

২৮

বিশ্বব্যাপী সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন

দেশ-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এক পরম 'অস্তি'র অম্লান অধিষ্ঠান: বেদান্তের এই মৌল সত্যের উপরই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা। আধ্যাত্মিক মানসিকতা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র ইহলৌকিক প্রাণ-প্রত্যয়ের দিক থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্মসমন্বয়ের সাধনা এবং "যত মত তত পথ"-ধর্মাদর্শ সর্বদেশের সর্বকালের সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের পৃথক পৃথক স্বাধীন অস্তিত্বের ও স্বাধিকারের সহজ স্বীকৃতিদানের এক মহান মুক্তি-সনদ। বস্তুতঃপক্ষে মন্ত্রদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্য মহামন্ত্র—"যত মত তত পথ"—একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির, পরিবার ও রাষ্ট্রের,—এই জগৎ ও জীবনের সকলের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অদ্বিতীয় এক সার্বভৌম দলিল। তাছাড়া আজকের পৃথিবীতে তো এই মতবাদেরই সংঘাত। সকলেই যে যার মতকে একমাত্র অভ্রান্ত সত্য বলে ঘোষণা করছে এবং তারই ফলে চারদিকে আজ এত সংঘর্ষ ও বিরোধের বীজ উপ্ত হচ্ছে। মতান্তর প্রথমে মনান্তরে এবং মনান্তর শেষ পর্যন্ত কায়িক আক্রমণ এবং রক্তাক্ত সংঘাতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর এই বৃদ্ধ অচলায়তন (Establishment)—সে তো চিরকালই নিজের মত ও পথকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে বিজয়ী তার উদ্ধত রথের চাকা চালিয়ে দেয় সবার উপর দিয়ে। শাসনের নামে চলে অবাধ শোষণ ও সন্ত্রাস, ঘৃণ্য অমানবিক নিপীড়ন ও গোপন প্রতীকী প্রচ্ছন্ন লুণ্ঠন। ঠাকুর তা হতে দেবেন না বলেই এবারে এসেছেন এই পৃথিবীতে আমাদের ভারত-ভূখণ্ডে। তাই যুগসঞ্চিত স্তূপীকৃত নোংরা আবর্জনার জঞ্জাল সাফ করার জন্যই এমনি করে মুক্ত ধারার বাঁধ ভেঙে দিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মত-পথের নিত্য

দ্বন্দ্বের যুগে সকলকে দিয়ে গেলেন মত-পথের মুক্ত স্বাধীনতা। ছোট বড় উচ্চ-নীচ সকলের মতকেই সমান মর্যাদা দানের মানবিক নীতি ঘোষণা করে গেলেন। ব্যক্তি-মানব ও সমষ্টি-মানবকে একই বিন্দুতে যুক্ত করে এমন করে মহত্তম মর্যাদার আসন দান করেন নি পৃথিবীতে আর কেউ কোনোদিন। ম্যাৎসিনি-গ্যারিবল্ডি, রুশো-ভোলতেয়র, কিংবা মার্কস-এঙ্গেল্‌স্-লেনিনের চেয়ে এই দৃপ্ত বিজয়ী মানবমুক্তির ঘোষণা সার্বিক সংযোজনায় অনেক বেশী সামাজিক তাৎপর্যে মণ্ডিত এবং বিশ্বশান্তিরও অনেক স্থায়ী বলীয়ান প্রতিশ্রুতি। বিশ্বৈক্যবোধের ভিত্তিও এমন সুদৃঢ় প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি আর কেউ। ক্ষমতার তারতম্য ও অর্জনের আভিজাত্য-দীনতা-নির্বিশেষে,—ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, দুর্বল-শক্তিমান সকল জাতিকে, সব গোষ্ঠীকে, সকল মানুষকে—স্থির অথচ প্রিয় প্রত্যয়ে এই মাটির পৃথিবীতে দাঁড়াবার ভূমি দান করেছে এই "যত মত তত পথ"-তত্ত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ একই সঙ্গে জাতি-ধর্ম-অবস্থা অর্থ-বিদ্যা এবং স্ত্রী-পুরুষ স্থান-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সকল মানুষকে, সব জাতিকে যার যার নিজস্ব ভূমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার স্বাধিকার দান করে গেছেন। সমষ্টিগতভাবে এই তত্ত্বের প্রয়োগের কথা ভেবেই আচার্য বিনয় সরকার এই আশ্চর্য বাণীখণ্ডকে বিশ্ব-গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি ও নিয়ামক-সূত্র বলে অভিহিত করেছেন। শুধু বিশ্ব গণতন্ত্র নয়, ভারত-বিঘোষিত আজকের পঞ্চশীল নীতির এবং বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিত্তি নির্মাণ করেছে এই "যত মত তত পথ" জীবন-তত্ত্বটি। তাই অনেক রাষ্ট্র-নীতির পণ্ডিত, প্রজ্ঞাবান মনীষী মনে করেন :—স্যানফ্রানসিস্‌কোয় নয়, নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটনে নয়, জেনিভায় নয়, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের মূল আদর্শ-ধারা (U. N. Charter) প্রথম বিরচিত হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে, কামারপুকুরে। যত ছোট, যত ক্ষুদ্র বা দুর্বল দেশই হোক, আজ যে নিজের কথা বিশ্বের দরবারে এসে সে ব্যক্ত করতে পারছে —তার পশ্চাতে ঐ পাঁচ টাকা মাইনের পুরুত, দরিদ্র ব্রাহ্মণের মহামন্ত্র —"যত মত তত পথ।" ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আজ আর বিশ্বগ্রাস বা পররাজ্যলুণ্ঠন সম্ভব নয় কারো পক্ষেই :—নতুন করে আর আলেকজাণ্ডার, তৈমুর লঙ্‌, চেঙ্গিস্ খান্, মহম্মদ ঘোরী, সুলতান মামুদের মত বিশ্ব-দস্যু বিশ্ব-দানবের পুনরুত্থানের কোনো সম্ভাবনা নেই। এর

পশ্চাতেও ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণের আবিষ্কৃত চারটি শব্দের ছোট্ট বাক্যটি। যদিচ বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের আগ্রাসন যে ছেড়ে দিয়েছে তা নয়; বরং সুযোগ ও সুবিধেমতো গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ও অন্তর্কলহে বিদীর্ণ দুর্বল ক্ষুদ্র পররাজ্য গ্রাসের নানা উদ্যোগও নিচ্ছে, কিন্তু সবই গোপনে সুড়ঙ্গ পথে অন্যতর কোনো অতি প্রচ্ছন্ন ভূমিকায়। কিন্তু আজ আর কোনো বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রও দিগ্বিজয়ের নামে বিশ্ব লুণ্ঠনের দম্ভ প্রকাশ করতে পারছে না, গায়ের জোরের পাশব শক্তির নির্লজ্জ আস্ফালন করতে সাহস করছে না। একমাত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পবিত্র দায়িত্বেই—নির্দিষ্ট দেশের বিধিসম্মত সরকারের আহ্বানেই সে দেশের মাটিতে সৈন্য-সামন্ত অস্ত্রশস্ত্র সহ তাদের উপস্থিতি। শান্তি স্থাপিত হলেই ইত্যাদি ইত্যাদি! আজকের পৃথিবীর এই যে বিরাট পরিবর্তন এ সব সম্ভব হয়েছে একমাত্র ঠাকুরের ঐ মহামন্ত্রের (যত মত তত পথ) মহাশক্তির অপার ঐশ্বর্যে ও পৃথিবীব্যাপ্ত তার দুর্বার প্রভাবে।

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদের মধ্যে যে বিপ্লবচিন্তা ও বিশ্বমানবতার সার্বভৌম কল্যাণপ্রয়াস বিধৃত রয়েছে—সে প্রসঙ্গে দুচারটি কথা। এদেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা ভক্ত-শিষ্যদের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করে থাকেন; অন্ততঃ সুমধুর বচনবিন্যাসে ইতিমূলক আশীর্বাদে ধন্য করে থাকেন প্রিয় ভক্তমণ্ডলীকে। মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরী, মামলায় জয়, শত্রু-নিপাত, লটারি লাভ প্রভৃতি সকল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাই এর অন্তর্গত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদের ভাষা একটিই—"তোমার চৈতন্য হোক।" অর্থাৎ মানবিক চেতনায় বা শুদ্ধ বোধে ও বিবেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে—ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়—নিজে দেখে চিনে নাও। তারপর বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো—কোন্ পক্ষে যোগ দেবে তুমি—দেবতার না দানবের শিবিরে। রবীন্দ্রনাথ একদা "দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে"—তাদের ডাক দিয়ে হুঁশিয়ার করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার অনেক আগে প্রত্যাসন্ন আর এক কুরুক্ষেত্রের মুখোমুখি পৃথিবীর সকল সৎ, বিবেকী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে একটি মাত্র আশীর্বাদে ন্যায় ও সত্যের শিবিরে সমবেত করে গেলেন যুগ-সারথি শ্রীরামকৃষ্ণ। এবং যারা শান্তির স্বপক্ষে, শুদ্ধ মানবতার সমর্থক যারা, শাশ্বত জীবনের অভিমুখী

এক মহান মুক্তি প্রত্যয়ে যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,—তাদের অক্ষয় তূণীরে উত্থিত-বিবেক ও আত্মজাগৃতির একটি নতুন অথচ সর্বশক্তিধর বিজয়ী শস্ত্র সংযোজন করে দিয়ে গেলেন। এবং এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পাদন করে গেলেন যুগাবতারের পরম কৃত্যসমূহ ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার এক নতুন পথ-নির্দেশ দান করে।

শ্রীগুরুর এই অসাধারণ বিশ্ববীক্ষা এবং বিশ্বশান্তির পথ-নির্দেশের সন্ধান জেনেই স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পেরেছিলেন যথার্থ জাতীয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোনো বিরোধ নেই। সঙ্গে সঙ্গে একথাও উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন সাংস্কৃতিক পরাধীনতার হাত থেকে বাঁচতে হলে, পরধর্মের অন্ধকার অতলে তলিয়ে যেতে না চাইলে, পিতৃসম্পদের সঙ্গে—অর্থাৎ দেশের অতীতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ঘটাতে হবে। চোখের সম্মুখে রাখতে হবে ঘরের সম্পত্তি—একথাও আগে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রেণী-সংগ্রাম নয়, শ্রেণী-সাম্য ও লোক-মিলনই যে ভারতীয় সমাজতন্ত্রবাদের কাঙ্ক্ষিত, এ কথাও পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে মতান্তরের ফলে কখনোই মনান্তর হতো না। হিংস্র জান্তব আক্রমণে দেহান্তর ঘটাবার তো কোনো প্রশ্নই ছিল না। অথচ আজ এখানে সবই অন্য রকম। তবু আজকের এই শ্রেণীতে শ্রেণীতে, বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে মানবিক মিলন ও ঐক্যস্থাপনার দায়িত্ব স্বামীজী তুলে দিয়েছেন দেশের যুবকদের হাতে। স্বামীজীর প্রচণ্ড ভরসা ছিল যুবশক্তির উপর। অথচ আমাদের দেশের যুবশক্তি আজ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট—বিশেষ করে রাজনীতির দাদাদের প্রশ্রয়ে ও পরামর্শে পরধর্ম গ্রহণ করে আত্মহা বিনাশের দিকে ধাবমান। নীতিভ্রষ্টতা ও চরিত্রহীনতা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। অথচ নীতি ও ধর্ম মানে যে অন্ধ গুরুবাদ নয়, দেশাচারের কাছে আত্মবিক্রয় বা বিবেকহীন প্রথানুগত্য নয়,—নয় অলৌকিকতার আশ্রয়ে অক্ষম বিলাসী অনুবর্তন :—তাও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন স্বামীজী আমাদের। ধর্ম ব্যবসার পণ্যবস্তুও নয়, কিংবা রাজনৈতিক কোনো উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার বিষয়ও নয়—এ সম্পর্কেও স্বামীজী হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছেন আমাদের বহুদিন আগে। পূর্বোক্ত ধরণে বিচারহীন ধর্মের অনুসরণের ফল হয় ভয়াবহ, বিপর্যয় বহন করে নিয়ে আসে জাতির

সামাজিক জীবনেও। ধর্মের নামে এভাবে অমানবিক অন্ধ প্রথানুগত্য ও অলৌকিকতার চর্চা এবং স্বার্থবুদ্ধির চরিতার্থতা আসলে অধর্ম। তাই তিনি বললেন, অধর্মের চেয়ে বরং ধর্মহীনতা বা নাস্তিকতা অনেক ভালো। তাতে তবু মুক্তির আশা আছে। সত্যিকার ধর্ম মানুষের জীবনে নিয়ে আসে শান্তি আনন্দ অভয়। সমষ্টিগতভাবে সত্য ধর্মের অনুশীলন জাতির ঐহিক জীবনেও নিয়ে আসে শৃঙ্খলা, কর্তব্যবোধ, দায়িত্বশীলতা এবং পরিণামে আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সকল প্রকার ঐহিক জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অনটনের হাত থেকেও মুক্তি। সকলের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই ধর্মের একক অন্বিষ্ট, একমাত্র লক্ষ্য। সত্যিকারের ধর্ম হল মানুষের অন্তর্নিহিত মহান আত্মশক্তির বিকাশ ও মানবকল্যাণে তার সম্প্রয়োগে প্রয়াসী হবার প্রেরণা দান।

যে সব সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কটের কথা এখানে আলোচনা করা হল তা শুধু ভারতেরই নয়,—মোটামুটিভাবে বলা যায় এই রূপচিত্র আজ সমগ্র পৃথিবীর। এই সবই আজকের যুগসমস্যা। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানুষ আজ মনুষ্যত্ববোধহীন, বিবেক-ন্যায়-নীতি-বর্জিত, ব্যক্তিত্ব-হারা চরিত্রভ্রষ্ট জীবতা-সর্বস্ব হয়ে যাচ্ছে। সর্ব-ঐক্যচ্যুত—নিঃসঙ্গ একাকিত্ব-বোধে বিপন্ন আজ বিশ্বমানবতা, মানুষের মন। "বন্যার তীব্র জল-স্রোতে ছিন্নমূল উদ্ভিদের মতো অসহায় ভেসে চলেছে মানুষ": নিজের চতুর্দিকে নানা ধরণের অসঙ্গতি, অব্যবস্থা, অনিশ্চিতি তাকে গ্রাস করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দশ হাতে তাকে নানা উপকরণের ডালা সাজিয়ে দিচ্ছে,—অপর্যাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্তূপীকৃত নানা বস্তুপুঞ্জের অজস্র উপহার। কিন্তু তবু ক্ষুধা তার মিটছে না।—চিত্ত তার কিছুতেই ভরে উঠছে না। জীবনের কোথাও সে যেন আর ঐক্য বা সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছে না।—সমাজের চারিদিকে সে চেয়ে দেখছে—ব্যক্তিগত বা সংসারের উন্নতি ও বিজ্ঞানের সর্বাত্মক অগ্রগতির মধ্যে অসঙ্গতি, বুদ্ধি ও বিবেকের মধ্যে অসঙ্গতি, স্বার্থবোধ ও শুদ্ধ প্রেমের মধ্যে অসঙ্গতি। কিছুতেই সে হিসাব মিলাতে পারছে না। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র একটি শুদ্ধ সুন্দর মধুর ঐকতানে কিছুতেই বেজে উঠছে না। সকলেই যেন বিপন্ন, বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত, বেদনায় বিদীর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মনীষীবৃন্দ, যেমন, জুলিয়ান হাক্‌সলী,

পিতিরিম সোরোকিন, হেনরী হুইলার, এরিক ফ্রস্ট, আর্নল্ড টয়েনবি, উইল ডুর‍্যাণ্ড, এরিক কাহ্‌লার, নোয়াম চম্‌স্‌কী, মার্লো পন্টি—প্রভৃতি আরো অনেকে—আজকের মানুষের জীবনের এইসব সমস্যা নিয়ে অনেক ভেবেছেন—চিন্তা করেছেন। এবং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সব মনীষীই কিন্তু উর্ধ্বায়িত চিত্ত-চেতনার পরিতৃপ্তি বা অন্তরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার সাধনাকে গ্রহণ করার মধ্যেই মানব সমাজের সব সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞান মানুষের সব ক্ষুধা, সব পিপাসা মেটাতে পারে না। বাইরের বস্তু-প্রাপ্তি সব সুখের সন্ধান দিতে পারে না। অশান্তির আগুন নিভাতে পারে না। জীবন-জাত আমাদের অনেক জ্বালা-যন্ত্রণাই জুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় না প্রযুক্তিবিদ্যা বা বিজ্ঞানের দ্বারা সমাহৃত অসহায় স্তূপীকৃত বস্তুপুঞ্জ। আমাদের 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরের বিপন্ন বিস্ময়ের' কোনো সমাধান খুঁজে পাই না। দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত ভারতের বেদান্তবাদ—সেই বিশ্বৈকাবোধ ও সর্বাস্তিবাদের শরণ নেবার কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাই বলেছেন। স্বামীজী একথা অনেক আগেই বলেছেন যে ব্যক্তি-মানুষের পূর্ণতা এবং বিশ্বশান্তির একমাত্র প্রতিশ্রুতি আমাদের এই বেদান্তবাদ। সর্বত্র সকলের মধ্যে সেই অদ্বয় 'এক'-এর অধিবাসনা প্রত্যক্ষ করে সকলকে নিজের মতো করে দেখার সাধনা: সকলের জন্য প্রীতি ও ভালোবাসার অর্ঘ্য উপহার প্রেরণ করাই হচ্ছে মানুষের, মানব-সভ্যতার একমাত্র বাঁচার পথ। বিশেষ করে আজকের এই আণবিক যুগে যখন মাথার উপর শেষ বিশ্বযুদ্ধের খড়্গ ঝুলছে, তখন এই ভারতীয় পথের অনুবর্তন ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাই স্বামীজীর প্রত্যয়ী প্রাণ-ঘোষণা: "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" পৃথিবীতে বহু ধর্ম আছে; তাদের নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানেও নানা পার্থক্য। তাই ধর্ম, ঈশ্বর, আধ্যাত্মিক চেতনা, দর্শনের দুরূহ তত্ত্ব প্রভৃতি দূরে সরিয়ে রেখে সকল মানুষের পক্ষে ধর্মচর্চার একটি সার্বভৌম সার্বজনিক বাস্তব পন্থারও সন্ধান দিয়ে গেছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন। যার অনুশীলন সকল মানুষের পক্ষেই সহজে সম্ভব। সেটা হলো সেবাধর্মের সার্বিক প্রয়োগ। জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার অধিকার আছে সকলেরই। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন বা সর্বত্র পরম অস্তির অনুভূতি (Supreme Consciousness), অর্থাৎ ভারতীয়

দর্শনের বহু পরিচিত সেই সর্বাস্তিবাদ বা কর্মে পরিণত বেদান্তেরই সূত্র। বস্তুতঃ বেদান্তের এই বৃহৎ ভূমিতেই জাতি-ধর্ম-স্থান-কালনির্বিশেষে সকল মানুষের মহামিলন সম্ভব। এবং এ পথেই বিশ্বৈক্য ও বিশ্বশান্তি স্থাপিত হতে পারে। তাই মূল বেদান্ত সূত্রেরই অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, বিশ্বের সমস্ত মানুষের সহজ সাধনার জন্য দুটিমাত্র মন্ত্র দিয়ে গেলেন স্বামীজী: (১) "দরিদ্র দেবো ভব," (২) "মূর্খ দেবো ভব।" সমাজবদ্ধ মানবের সমষ্টিগত প্রয়োগের কথা ছেড়েই দিলাম—প্রতিটি মানুষ যদি তার ব্যক্তি জীবনে প্রতিদিনের চর্যায় অন্ততঃ একবার এই দুটি মাত্র মন্ত্রের অনুবাদ ও সম্প্রয়োগ ঘটাতে পারে—তাহলেও এই পৃথিবী একদিন মানুষের বসবাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এবং ক্রমশঃ যদি এই মহামন্ত্রদ্বয়ের সম্প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যক্তিজীবন থেকে সমষ্টিজীবনের বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত করে দেয়া যায়, তাহলেই মানবসমাজে অবিলম্বে একদিন স্থাপিত হতে পারে বিশ্বজনীন সমাজতন্ত্রবাদ। কি ব্যক্তিগত—কি সমষ্টিগত জীবনে একমাত্র সেবা প্রকল্পের মাধ্যমেই সাধ্য এই মহামন্ত্রদ্বয়। এবং এভাবেই সম্ভব জীবনে জীবন যোগ করার অভিজ্ঞান অর্জন করে জীবন রচনা করা এবং পরিণামে মহাজীবনের অভিযাত্রী হওয়া।